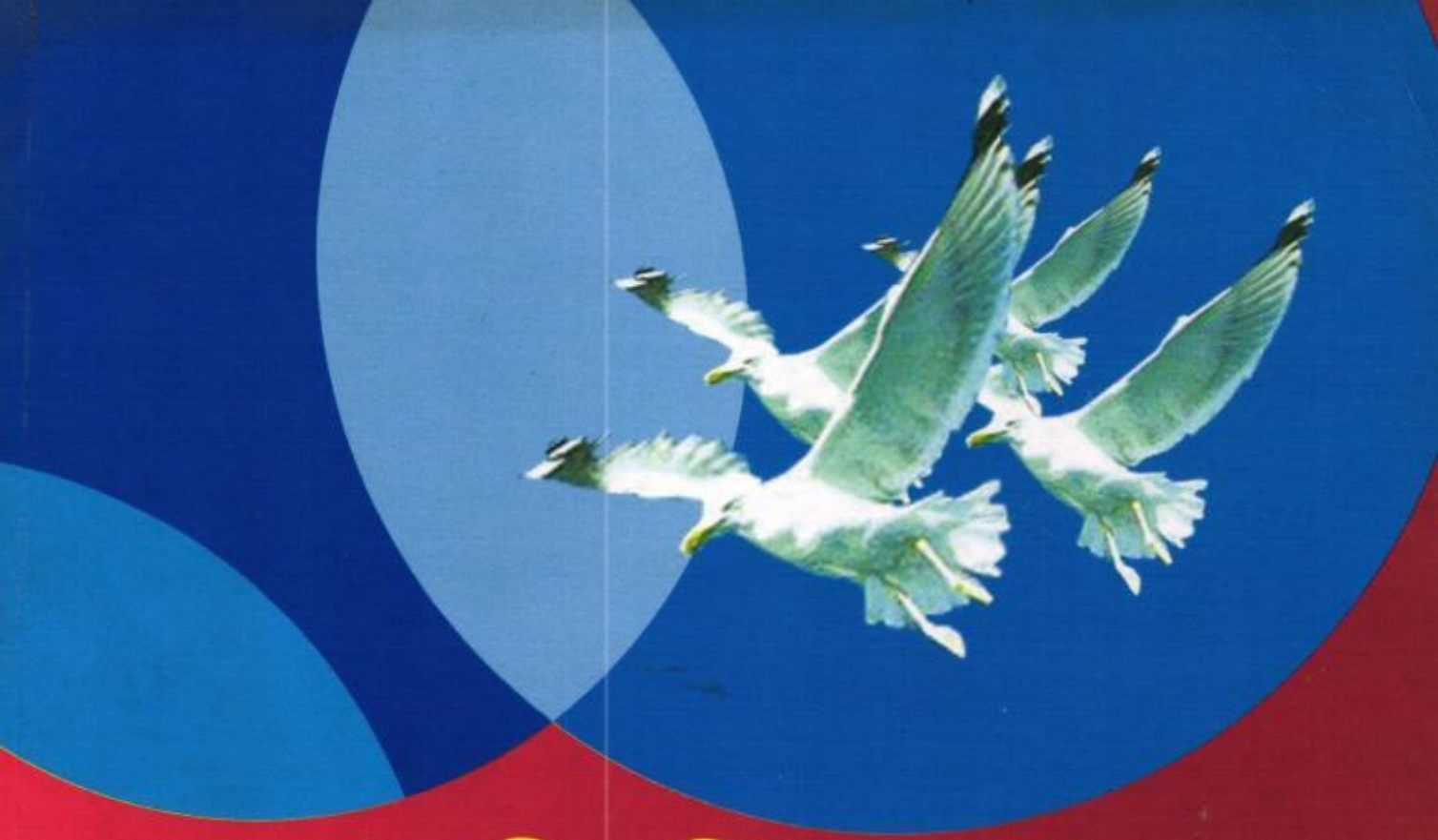

অতিথি পাখির কান্না

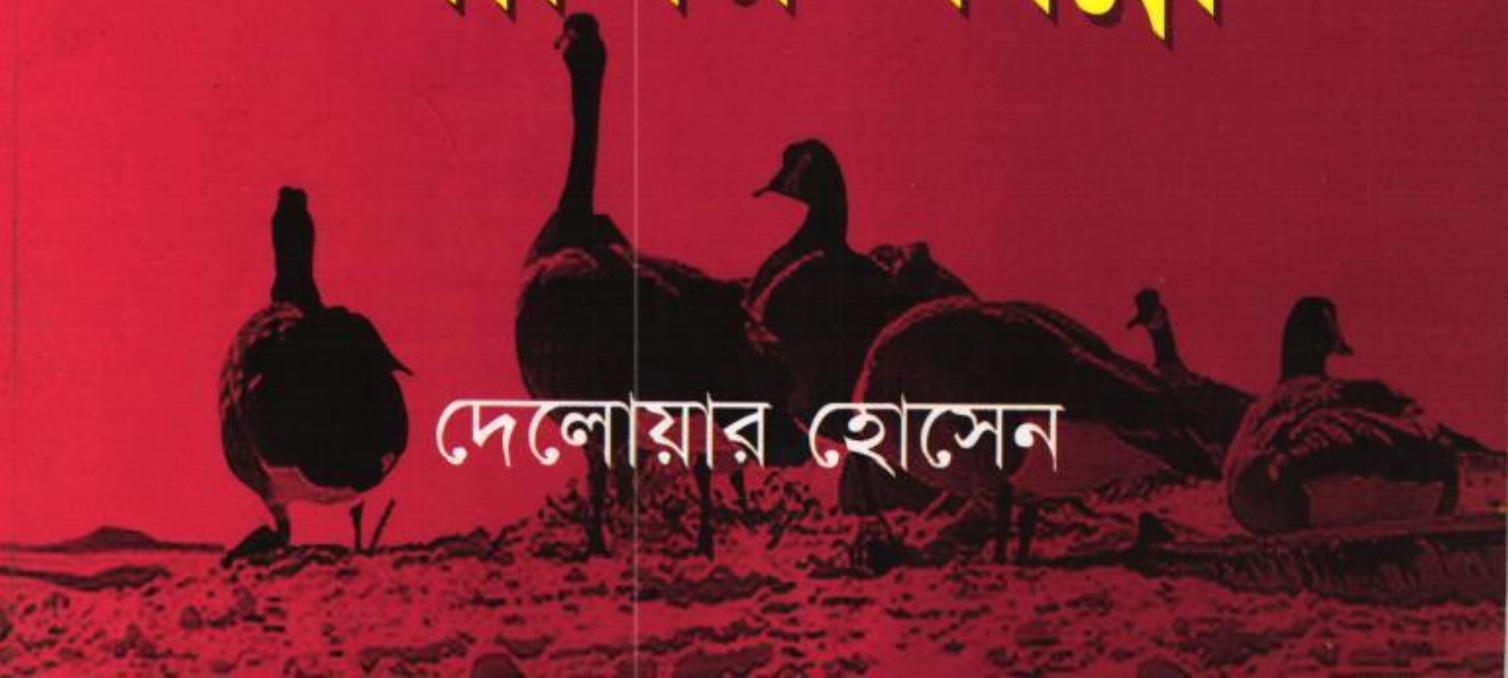

দেলোয়ার হোসেন

দেলোয়ার হোসেন

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

অতিথি পাখির কান্না

দেলোয়ার হোসেন

প্রকাশনায়
খেয়া প্রকাশনী
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
সামিউল হোসেন সামি

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা-২০০৯

কম্পোজ
ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহসান কম্পিউটার, কাটাবন, ঢাকা

মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স, বাবুপুরা, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
নাসির উদ্দীন

অলংকরণ : মুজিবুর রহমান খান

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সূচী-পত্র

- ঈদের খুশি ॥ ৫
- অতিথি পাখির কান্না ॥ ১১
- অতুর স্বীকারোক্তি ॥ ১৭
- নেংটি ইঁদুরের গল্প ॥ ২১
- রেজি ও মরামির গল্প ॥ ২৬
- ছবির খাতা ॥ ৩১
- খালার বাড়ি যাব কাজী ॥ ৩৮
- নূর মাস্টারের বংশধর ॥ [illegible]
- ফোর মাস্টারের [illegible]

www.pathagar.com

ঈদের খুশি

খাঁ বাড়ির আটচালা কাচারির সামনে মানুষের ভিড়। প্রতি বছরের মতো এবারও শেষ রোযার ইফতারির দাওয়াত খেতে এসেছে পাড়ার রোযাদাররা। সবাই খুশি খুশি মন নিয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিকে। এ এক নীরব প্রতিযোগিতা। কে প্রথম দেখতে পাবে ঈদের নতুন বাঁকা চাঁদ। কিন্তু কারো নজরেই আসছে না রূপালী রেখার সেই খুশির ঝিলিক। এদিকে ইফতারির সময়ও প্রায় হয়ে আসছে।

খাঁ সাহেব বললেন, আকাশে মেঘ থাকার কারণে চাঁদ দেখা নাও যেতে পারে। তবে কোথাও দেখা গেলেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে তা প্রচার করবে। আপনারা ইফতারির জন্য তৈরি হয়ে যান।

ঠিক তখনই কে একজন চিৎকার করে উঠলো– ঐ যে ঈদের চাঁদ উঠেছে।

আল্লাহু আকবার! ঈদ মোবারক। খাঁ সাহেবও এগিয়ে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, কই, কোথায় চাঁদ? বলেই চশমাটা খুলে আর একটু পরিষ্কার করে আবার বললেন, কে দেখেছে?

www.pathagar.com

তখন লম্বা নারকেল গাছের মাঝামাঝি থেকে মজনু বললো, ঐ যে চাঁদ দেখা যায়। আপনি দেখতে পারছেন? খাঁ সাহেব বললেন, না রে মজনু, তুই গাছ থেকে আগে নেমে আয়। মজনু নেমে এলো এবং আঙুল তুলে দেখালো– ঐ যে লালিচরা মেঘটা, তারই এক হাত ওপরে। তখন সবাই বললো, হ্যাঁ ঐ তো ঈদের চাঁদ। সাথে সাথে ঈদের আনন্দ যেনো ছড়িয়ে পড়লো সব মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।

মজনু গাঁয়েরই ছেলে। খাঁ সাহেবের নাতি টুটুলের সহপাঠী। তবে মজনু একটু দুরন্ত। সব কাজের কাজিও। খাঁ সাহেব বললেন, মজনু অযু করেছিস তো?

– বাড়ি থেকে অযু করেই এসেছি দাদা।

– তবে দেরি কেন, বসে যা।

এর মধ্যেই মাগরিবের আযান শেষ হয়ে গেছে। সবাই আনন্দ চিত্তে ইফতারি শেষ করে নামাযে দাঁড়ালো। আজ আর তারাবি পড়তে হবে না। তবে এক্ষুণি যে ঈদগাহের মাঠে যেতে হবে এবং ঈদগাহ সাজাতে হবে, একথা সবারই জানা।

রাতের খাবার শেষ হলে জাকির বললো, পাড়ার ছেলেরা সবাই শোনো। এবার আমরা আমাদের ঈদগাহের মাঠ এমনভাবে সাজাবো, যেন অন্যরা দেখে অবাক হয়ে যায়। আর নামাযিদের প্রাণটাও ভরে যায়। তা ছাড়া এক মাস সিয়াম সাধনার পর, নামাযিরা যদি সুন্দর পরিবেশে ঈদের নামাযই না পড়তে পারে, তাহলে কি তারা পরিপূর্ণ আনন্দ পাবে? সবাই বললো, কথাটি ঠিকই, নতুন চাঁদ, খুশির ঈদ, নতুন জামা-কাপড়, তার সঙ্গে সাজানো গোছানো ফুলবাগানের মতো ঈদের মাঠ না হলে চলে?

জাকির পাড়ার ছেলে। শহরের কলেজে পড়ালেখা করছে। ওর সঙ্গে কলেজ পড়ুয়া আরও দু'তিন জন বন্ধু রয়েছে। ওরা খাঁ সাহেবের বাড়ি থেকে একটা হেচাগ লাইট জ্বালিয়ে নিলো। পিছু পিছু দল বেঁধে চললো পাড়ার ছেলেরা। বড়রা বিভিন্ন কারণে এখন আর আগের মতো সময় দিতে পারে না গাঁয়ের সব কাজে। তবে ঈদে তাদের উৎসাহের কমতি নেই।

যেতে যেতে মজনু বললো, জাকির ভাইয়া, আমি, টুটুল, বকুল আর রান্নুর কিন্তু সারারাতই তোমাদের সাথে থাকবো। জাকির বললো, ওগো দুরন্ত, তুমি এবার কোন ক্লাসে পড়ছো? ঠিকমতো পড়ালেখা করো তো? যে দিকে তাকাই সেদিকেই দেখি মজনু আর মজনু।

www.pathagar.com

কথা শুনে সবাই হেসে ফেললো। মজনু বললো, কেন, এবার আমি ক্লাস থ্রিতে। টুটুল ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড।

– এবার কয়টা রোযা রেখেছিস?

– আজকের রোযা নিয়ে মোট একুশটা।

– চমৎকার! ঈদের খুশি সবটুকুই তো তোর প্রাপ্য। তোর আব্বা কি ছুটিতে এসেছে?

– না। তবে মা বললো, বেলাবেলি না এলে আব্বা নাইট কোচে চলে আসবে। এবার আব্বা আমার জন্য নতুন জুতা, পাঞ্জাবি, পাজামা সব নিয়ে আসবে খুলনা থেকে।

তাহলে তো আমাদের মজনুকে এবার দারুণ দেখা যাবে। কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। এর মধ্যে সবাই পৌঁছে গেল ঈদের মাঠে। বড়রা মিলে মিশে কাজ ভাগ করে দিলো সবার মধ্যে। তার পরই শুরু হয়ে গেলো কাজ আর কাজ। কেউ ছুটলো বাজারে, কেউ ছুটলো কলাগাছ কাটতে। কেউ আবার পাড়া থেকে বাঁশ আনতে গেলো।

চলছে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে মাঠ সমান করার কাজ। মাঠের আবর্জনা পরিষ্কার করছে ছোটরা। চারপাশের আগাছাও তুলে ফেলছে কেউ কেউ। একটি ছেলে বালতিতে চুন গুলিয়ে সুন্দর করে পোচ লাগাচ্ছে ঈদগাহের মেহরাব ও মিম্বরে। কেউ বসে নেই। হাসি আনন্দের মধ্যে কাজ করছে সবাই।

এর মধ্যে বাজার থেকে এলো রঙিন কাগজ, রশি, এরারোট এবং "ঈদ মোবারক" লেখা লম্বা এক খণ্ড কাপড়। যা পূর্বেই দর্জির দোকানে দেয়া ছিলো। এবার শুরু হলো রঙিন কাগজের ঝালর আর ছোট ছোট তিন কোণা পতাকা কাটা। তারপর কলাগাছ পুঁতে ঈদগাহের তোরণ তৈরির কাজ। তোরণের বাঁকা চটায় রঙিন কাগজের ঝালর দিয়ে সাজানো হলো। মাঠের চারদিকে খুঁটি পুঁতে লাল, নীল, সবুজ কাগজ লাগানো লম্বা রশি বাঁধা হলো সেই খুঁটিতে। সাদা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা হলো "ঈদ মোবারক"।

দেখতে দেখতে রাত প্রায় দু'টো বেজে গেলো। বড়রা বললো, ছোটরা, এবার তোমরা যার যার বাড়ি ফিরে যাও। কাল সকালে গোসল করে নতুন জামা-কাপড় পরে চলে আসবে ঈদগাহে। মজনু বললো, ঘুম আসছে না। জাকির বললো, রাতে না ঘুমালে যে সকালে উঠতে পারবে না। বাকি কাজটুকু সেরে আমরাও চলে আসছি। তখন ছোটরা সবাই বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। আর সবাই যেতে যেতে সুর করে গাইতে শুরু করলো–

www.pathagar.com

ও মন রমযানের ঐ রোযার শেষে
এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন
আসমানী তাকিদ ॥

সকালে নামায পড়ে রান্না ঘরে যায় মজনুর মা। কোন ঈদের বাজারও হয়নি ওদের। অনেক ভেবে, চাল-ডাল একত্রে খিচুড়ি রাঁধতে বসে। বেলাও হয়েছে বেশ। মজনু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রাতে ঈদের মাঠে কাজ করছে– তাই, মা আর ছেলেকে ডাকে না। সে জানে মজনু ঘুম থেকে জেগেই ওর আব্বাকে খুঁজবে। না দেখলে কি যে কাণ্ড করবে, তা এক আল্লাহ্ই জানেন।

মজনুর মা কেবলই ছটফট করতে থাকে। কখন জানি এসে মজনু বলে ডাক দেয় তার আব্বা। আবার ভাবে, সে কি ঈদের বোনাস-টোনাস কিছু পায়নি! বেসরকারী চাকরি, এবার যদি বোনাস না দেয় তখন? আবার ভাবে, পথে কোন অঘটন ঘটেনি তো! বালাই সাট, এসব আমি কী ভাবছি। কিছু ভালো লাগে না মজনুর মায়ের। আবার এগিয়ে যায় দেউড়ির দিকে। মনের মধ্যে কেমন গুমরে ওঠে কান্না।

হঠাৎ ঘুম ভাঙে মজনুর। মনে পড়ে আজ ঈদ। ঘরের চারদিকে তাকায়। ছুটে যায় অন্য ঘরে। কোথাও তার আব্বার ব্যাগ, জুতা, কাপড় কিছুই নেই। মজনুর ছোট্ট বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠে। ভীষণ অসহায়ের মতো কেবল ফোঁপায়। দৌড়ে যায় মায়ের কাছে। মা– আব্বা আসে নাই?

মা সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে, হয়তো এক্ষুণি চলে আসবে। তুই একবারে পুকুর থেকে গোসল করে আয়, গরম গরম খিচুড়ি খাবি। মজনু কিছু বলে না। ওর মন থেকে ঈদটা অনেক দূরে সরে যায়। খাঁচার পাখির মতো মনটা ছটফট করে ওঠে। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি কিচ্ছু খাবো না– গোসল করবো না, নামাযও পড়বো না। বাড়ি থেকে চলে যাবো– আর ফিরবো না!

– বাবা মজনু, আমার কথা শোন...

– তুমি যে বললে আব্বা সকালেই চলে আসবে! তুমিও তো একটা জামা কিনে দিলে না।

কি উত্তর দিবে মজনুর মা? মজনু কি জানে, তার মায়ের হাতে জামা কেনার পয়সা নেই?

www.pathagar.com

শেষে সত্যিই মজনু কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। মাও তার পিছু ছুটলো। বেলা তখন দশটার কাছাকাছি। গ্রামে ঈদের নামায একটু দেরিতে হলেও চারদিক থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। খাঁ সাহেবও তার নাতি টুটুলের হাত ধরে যাচ্ছেন ঈদগাহের দিকে। পথে মজনুকে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। পেছন থেকে সোনা মেম্বর এসে সালাম দিয়ে বললো, চাচা দাঁড়ালেন কেন? তার পরই মজনুকে কাঁদতে দেখে সে আবার বললো, ও– মজনু পাগলের পাল্লায় পড়ছেন বুঝি। ও কাঁদে কেন, ওর আব্বা বাড়ি আসেনি?

আপনি চলেন এক সঙ্গে যাই।

খাঁ সাহেব বললেন, তুমি যাও সোনা, আমার একটু দেরি হবে। তিনি মজনুর মাকেও দেখলেন ছেলের পিছন পিছন এগিয়ে যেতে। খাঁ সাহেব বললেন, বৌমা, মজনু কাঁদে কেন? ওকি নামাযে যাবে না! মজনুর মা আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো, ছেলেটা কত আশা করেছিল ওর আব্বা বাড়ি আসবে। রাতে ঈদগার মাঠে কাজ করে এসে বললো, মা আব্বা আসে নাই? আমি বললাম, সকালে আসবে। কিন্তু সে তো

www.pathagar.com

এখনো এলো না। ওর জন্য নতুন জামা, জুতা আনতে চেয়েছিল। এখন আমি ছেলেকে কি দিয়ে বুঝাই! বলছে বাড়ি ছেড়ে কোথায় নাকি চলে যাবে। ওর আব্বারই বা কি হলো!

ঘটনা শুনে টুটুলের মুখটাও কেমন কালো হয়ে গেলো। খাঁ সাহেব সবই লক্ষ্য করলেন। তিনি নাতিকে বললেন, যা তো টুটুল– পাগলটাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়।

ঠিক তখনই মোল্লা বাড়ির সহিদুল আসছিলো মোটর সাইকেলে। খাঁ সাহেব তাকে থামিয়ে বললেন, সহিদুল, জলদি একটু বাজারে যাও তো বাবা। মজনুর জন্যে পাজামা, পাঞ্জাবি, টুপি আর এক জোড়া স্যাণ্ডেল নিয়ে আসবে। এই টাকায় যদি না হয়, ওদের বলবে আমার নামে লিখে রাখতে।

এতক্ষণে টুটুল মজনুর হাত ধরে নিয়ে এলো দাদার কাছে। খাঁ সাহেব বললেন, তোর আব্বা মনে হয় নামাযের পরপরই চলে আসবে। ঈদের সময়, হয়তো সকালের কোনো বাসে টিকেট পায়নি। তোর জন্য নতুন জামা-কাপড় আনতে পাঠালাম। এবার যা, গোসল করে তৈরি হয়ে নে। কাপড় এলে আমরা এক সাথে নামাযে যাবো।

খাঁ সাহেবের স্নেহের ছোঁয়ায় মজনু ভেজা চোখ ঝরনার মতো হেসে উঠলো। সে হাসি নতুন চাঁদের রূপালি ঝিলিকের মতই মনে হলো খাঁ সাহেবের কাছে। প্রাণটা খুশিতে ভরে উঠলো তার। আকাশ বাতাস আর প্রকৃতির মধ্যেও যেনো সেই খুশির ঝিলিক দেখতে পেলেন তিনি। সবাই যেনো বলছে– ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। ■

প্রশ্ন

১. ঈদের চাঁদ দেখার জন্য ছেলেরা কোথায় ভীড় করছিল? কে প্রথম চাঁদ দেখতে পায়?

২. মজনু এবং পাড়ার ছেলেরা কেমন করে ঈদগাহের মাঠ সাজালো– বর্ণনা করো।

৩. খাঁ সাহেব ঈদগাহে যাবার সময় কী দেখলেন এবং কী করলেন?

www.pathagar.com

অতিথি পাখির কান্না

শীত এসে গেছে আগে-ভাগেই। ঘাসের ডগায় কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে বেলা অবধি ঘুমোয় রাতের শিশিরবিন্দু। কিন্তু অতিথি পাখিদের চোখে ঘুম নেই। ওদের আনন্দ উচ্ছল প্রাণের কলরবে মুখরিত চিড়িয়াখানার গোটা এলাকা। ধীরে ধীরে রোদের উত্তাপ বাড়ে। মিলিয়ে যায় কুয়াশাবসন। এক সময় টুপ করে ঝরে পড়ে রোদে জ্বলা শিশিরবিন্দু। সকাল বেলা পাখিদের কলকাকলিতে যদিও আমার ঘুম ভাঙে, তবু ছুটির অলসতায় শিশিরবিন্দুর মতোই রোদের উত্তাপ মেখে তবেই আমি বিছানা ছাড়ি।

কিন্তু সেদিন রাতে একটুও ঘুমোতে পারি নি আমি। বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই লোকটার মুখ। যার দু'হাতে ঝুলছিল দু'জোড়া অতিথি পাখি। আর আমার কানে বাজছিল তার হৃদয়হীনের মতো পাখি ধরার সেই বিশ্রী গল্প।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। অফিস ছুটির পর বখশীবাজারের একটা গলিপথে আমি হাঁটছি। সূর্য ডুবতে তখনো প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। ঢাকেশ্বরী থেকে বাস ধরে যেতে হবে মিরপুর। তারপর এ গলি সে গলি করে তবেই আমার বাসা। পথের দূরত্ব যাই হোক না

www.pathagar.com

কেনো, যানজট পেরিয়ে বাসায় পৌঁছাতে লেগে যায় পাক্কা দেড় ঘণ্টা। তার উপর শীতের বেলা। যতো তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততোই আমার জন্য মঙ্গল। কেননা, বরাবরই আমি শীতে বড় দুর্বল।

কিন্তু পরদিন শুক্রবার থাকায় তাড়াহুড়া না করে মোড়ের একটা চায়ের দোকানে চা খেতে বসলাম। ভাবলাম, শরীরটা একটু গরম হলে মন্দ লাগবে না। তো, বসার পরপরই কালো বেঁটে একটা লোক এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। লোকটার দু'হাতে দু'জোড়া হাঁস। হাঁস অর্থাৎ, অস্ট্রেলিয়া সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসা অতিথি পাখি। আমাকে লক্ষ্য করে বললো, স্যার হাঁস কিনবেন?

আমি কিছু না বলে হাঁসগুলোর দিকে তাকালাম। এতটা কাছ থেকে কখনো অতিথি পাখি দেখিনি। ঝাঁক বেধে উড়ে যেতে দেখেছি। কখনো এলোমেলো, কখনো সাজানো মালার মতো। লেকের পানিতে খেলা করতেও দেখেছি দূর থেকে। আবার টিভিতে দেখেছি নানা জাতের নানা রঙের পাখি। পাখিদের বিচিত্র জীবন। মায়া-মমতা, আর সুখ-দুঃখের কতো না চিত্র। আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে যেমন করে চাঁদ, তারা, সূর্য আর মেঘেরা মিলে অপরূপ করে রেখেছে আকাশটাকে, তেমনি সবুজ পৃথিবী জুড়ে পাখিরা, পশুরা মিলে গড়েছে এক স্বপ্নের ভুবন।

হাঁসগুলো কী সুন্দর। কী মসৃণ আলোয় ধোয়া ডানা। আকারেও বেশ বড়। কালো রঙের পালকের মধ্যে দু'একটি সাদা পালকও রয়েছে। ওদের পা এবং ডানা বাঁধা। অথচ এই ডানা মেলে ওরা হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এই বাংলাদেশে। এই ছোট দেশটির কথা ওরা জানে এবং চেনে। দেশটাকে সত্যি ওরা ভালোবাসে কিন্তু সেই ভালোবাসার এ কি প্রতিদান?

পাখিগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হলো, ওরা চিৎকার করে বলছে, তোমরা এত নিষ্ঠুর কেনো, এই দেশটাকে ভালোবাসি বলেই তো প্রতিবছর আমরা ছুটে আসি এখানে। রাতদিন একভাবে উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। দুর্বল হয়ে যায় আমাদের ডানা, তবু আসি। তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদেরও সংসার আছে, সন্তান আছে।

কিন্তু পাখিরা তো কথা বলতে পারে না। তাই, ওদের নীরব ভাষা কারো কানেই পৌঁছায় না।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো লোক এসে বসলো সেখানে। আমি পাখিওয়ালাকে প্রশ্ন করলাম, আপনার এই চারটি হাঁসের দাম কত?

– দুই হাজার টাকা।

টাকার গন্ধে পাখিওয়ালার চোখ দু'টো যেন চকচক করে উঠল।

একজন চোখ টেনে বললো, এত দাম! তার মানে একটা পাখি পাঁচশত টাকা। পাখিওয়ালা স্বগর্বে বললো, একটা পাখিতে কয় কেজি গোস্ত হবে তা একবার ভেবে দেখেছেন? এই বলে, এক জোড়া হাঁস এগিয়ে ধরল তার দিকে। টাকাই দেখবেন স্যার। শীত চলে গেলে এই পাখি কি আর কোথাও পাবেন? তা ছাড়া রাত জেগে, যে কষ্ট করে পাখিগুলো ধরা হয়, তার কি কোনোই মূল্য নেই?

পাখির দাম শুনে আমিও হতবাক। আমার সংসারের বেহাল অবস্থা। নুন আনতে পানতা ফুরায়। তবু আমার পকেটে যদি দু'হাজার টাকা থাকত, তাহলে এক্ষুণি পাখিগুলো কিনে উড়িয়ে দিতাম আকাশে।

অন্য একজন লোক বললো, ছোটবেলা বিল বাঁওড়ে অনেক পাখি দেখেছি। বন্দুক দিয়ে মারতেও দেখেছি। কিন্তু তাজা পাখি ধরতে দেখি নি কখনো। তোমরা কিভাবে এগুলো ধরো-বলো তো।

– অত কথা বলতে গেলে পাখি বিক্রি করবো কখন। আমি এখন নিউমার্কেট যাব। সিগনালে দাঁড়ালে গাড়ির আপারা এক দামে কিনে নিবে।

– নিউমার্কেট কি এক দিনের পথ যে, এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছো! দু'টো না হোক, একটা পাখি আমি নেব। আমি চা খেতে খেতে তোমার পাখি ধরার গল্প শুনবো।

পাখিওয়ালা হাসল এবং শুরু করলো তার পাখি ধরার গল্প।

এই হাঁসগুলো আমরা বিল থেকে ধরেছি। বিলের পানি এখন কম হলেও পাখিরা সাঁতার কাটতে পারে। আর প্রচুর ছোট ছোট মাছও আছে সেখানে। পাখিরা রাতের শেষ প্রহর থেকে রোদের উত্তাপ না বাড়া পর্যন্ত সেখানেই থাকে। তারপর চলে যায় বনে বাদাড়ে, গাছের ডালে। সারাদিন পর রাতের অন্ধকারে আবার চলে আসে বিলে। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাবার জন্য ওদের চাই একটা ভালো জায়গা। তাই আমরা কচুরিপানা এবং খড় দিয়ে ছোট ছোট ভাসমান স্তূপ তৈরি করে রাখি আগেই। আর বেলা থাকতেই সেই

www.pathagar.com

সব স্তূপের উপর দিয়ে বিছিয়ে দেই বড় আর মজবুত জাল। জালটা এমনভাবে বিছাতে হয়, যেন ওরা কিছুই বুঝতে না পারে। তারপর জালের এক প্রান্ত গুটিয়ে লম্বা বাঁশ বেঁধে রাখি। খড় দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে তৈরি করে সেখানে চুপচাপ বসে থাকি আমরা।

এক সময় অন্ধকারে পাখিরা আসতে শুরু করে। শাঁ শাঁ একটা আওয়াজ শুনতে পাই। এক একটা কচুরিপানার স্তূপে পাঁচটা অথবা দশটা করেও পাখি বসে। বসার জায়গা নিয়ে তখন হুড়পাড় কাণ্ড শুরু হয়। এক সময় সবাই স্থির হয়ে ঠোঁট দিয়ে শরীর চুলকাতে থাকে। আমরা তখন মরার মতো পড়ে থাকি যার যার জায়গায়।

রাত দু'টোর দিকে আর কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে চুপি-চুপি লক্ষ্য করি, ওরা ঘুমোল কিনা। পাখিরা ঘুমোবার সময় ঘাড়টা বাঁকা করে মাথাটা ডানার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তখন আমাদের দলের কেউ একজন একটা সংকেত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। দ্বিতীয় সংকেত দিলেই জাল বাঁধা বাঁশ দু'দিক থেকে উঁচু করে দ্রুত অন্য প্রান্তে নিয়ে পাখিগুলো ঢেকে ফেলি।

মুহূর্তে জেগে ওঠে পাখিরা। আর তখনই ওদের চিৎকার, ওদের দাপাদাপিতে অন্যরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। জাল নিয়েই যেন উড়ে যেতে চায় ওঁরা। বেরিয়ে যেতে চায় জাল ছিঁড়ে। এই সময় তিন-চার জন লোক জালের উপর সমানে পানির ঝাপটা দিয়ে পাখিকে আঘাত করতে শুরু করে। পাখিরা ভিজে নেয়ে ওঠে। ভারী হয়ে যায় ওদের ডানা। জালও গুটাতে গুটাতে নিয়ে আসা হয় এক জায়গায়। উলট-পালট হয়ে যায় পাখিরা। ডানা মেলার সুযোগও আর পায় না। তখন সবাই মিলে, একে একে ডানা বেঁধে ফেলি পাখিদের।

এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম।

ভাবলাম, এই লোকটা এত বড় অন্যায় কী করে করলো! এদের কি মায়া-মমতা বলে কিছু নেই? এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। হঠাৎ বলে ফেললাম, আপনি পাখি শিকার করে খুব অন্যায় করেছেন। আপনি জানেন না শীতের অতিথি পাখি ধরা দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষুণি পাখিগুলো ছেড়ে দিন।

উপস্থিত সবাই আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল নির্বাক। কারো চোখেমুখে এতটুকু প্রতিবাদের ছায়া দেখতে পেলাম না। আমি যেন নির্বোধের মতো কিছু বলে ফেলেছি। সবার মুখে কেমন হালকা হাসির মধ্যে ভারী তাচ্ছিল্যের নীরব স্বাক্ষর। শুধু চায়ের দোকানের

www.pathagar.com

কিশোর ছেলেটা বললো, কথাটাতো ঠিকই। টেলিভিশনে শুনছি, পাখি ধরা বা মারা খুবই বড় অপরাধ। পুলিশ দেখলে আপনার জেলও হতে পারে।

ছেলেটির কথা শুনে বেশ সাহসী হয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু দোকানের মালিক ঝাঁঝাল সুরে ধমকে উঠল, তুই চুপ থাক। আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর লয়ে তোর কাম কি?

আমি তখন অসহায় দৃষ্টি মেলে ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকাতে লাগলাম। এই মুহূর্তে যদি কোনো পুলিশ এসে যেত, তাহলে পাখি ধরার মজাটা টের পেত লোকটা। হঠাৎ সেই টাকাওয়ালা লোকটা আমাকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল, পাখি ধরলে আপনার অসুবিধা কোথায়? মানুষের খাওয়ার জন্যই তো হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগল, আরো কত কি আল্লাহ্ পয়দা করছেন। কোন্ কিতাবে লেখা আছে পাখি ধরা যাবে না, পাখি খাওয়া যাবে না। লোকটার কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম।

– আপনি কিতাবের কথা বলছেন কেনো? এটা দেশের আইনের কথা। আইন মেনে চলাই জনগণের কর্তব্য।

– রাখেন আপনার আইন। পাখিরা হলো স্বাধীন। এরা আইনের ধার-ধারে না। ওরা

www.pathagar.com

এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে আসে ইচ্ছে মতো। কিন্তু কখনো ওদের কোনো পাসপোর্ট লাগে না। তাই ওদের নিয়ে সরকারের কোনো আইন করা ঠিক না।

– ভুল বললেন, এই পৃথিবীতে মানুষের মতো পশু-পাখিদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাছাড়া পশু-পাখিরাই তো প্রকৃতির শোভা। ওরা আছে বলেই আমাদের এই পৃথিবী, আমাদের চারপাশ এত সুন্দর। ওরা তো কারো ক্ষতি করে না; বরং নানাভাবে আমাদের উপকারই করে চলেছে।

একটা হালকা হাসির ঢেউ ছড়াল দোকানটার মধ্যে। আমার কোনো কথাই গায়ে মাখল না কেউ। মাঝখানে কথা কাটাকাটিতে কথা শুধু বেড়েই চললো। এদিকে সূর্যটাও ডুবে গেছে কোন্ ফাঁকে। ধীরে ধীরে জমাট বাধতে শুরু করেছে কুয়াশা। চা খাওয়া আর হলো না আমার। রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাস ধরলাম।

মনটা এতই খারাপ হলো যে, রাতে আর ঘুম আসে না। কেবল এপাশ ওপাশ করছি। দু'চোখের পাতা এক করলেই ঘুমন্ত পাখিদের সেই বুক ভাঙা আর্তনাদ, সেই কষ্ট আমার মনটাকে আরো ব্যথিত করে তুলছিল। অনুরাগে চঞ্চল হল মন। হায়, আমি ঐ হাঁসগুলোর জন্য কিছুই করতে পারলাম না। একটু সাহায্যের আশায় ওরা কেমন করুণ চোখে চেয়েছিল আমার দিকে। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝিনি। ■

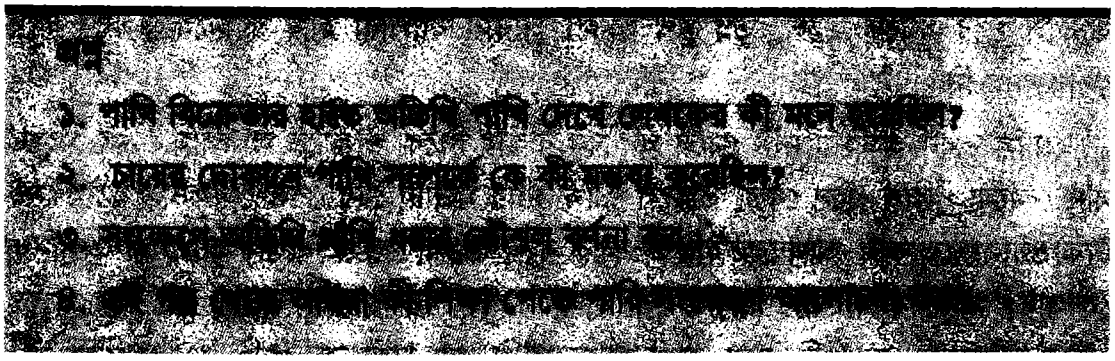

www.pathagar.com

অতুর স্বীকারোক্তি

আর মাত্র একটা ক্লাস শেষ হলেই ছুটির ঘণ্টা বাজবে। মহিব, অতু আর বেনী বই খাতা গুছিয়ে রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ওদের যেনো আর দেরী সইছে না। মহিব বললো, বাসায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে, বই নিয়ে বসতে হবে। ইন্সপেক্টর সাহেব নাকি খুব প্রশ্ন করেন। না পারলে স্কুলের বদনাম হয়ে যাবে। হেড স্যারও বকবেন। অতু বললো, কী প্রশ্ন করবে রে? বাংলা না ইংরেজি? মহিব বললো, সে কথা কি কেউ বলতে পারে? বাংলা থেকেও করতে পারে, আবার সমাজ থেকেও করতে পারে। মোটকথা, সব বইগুলোই একটু করে পড়া দরকার।

ওরা তিনজনই ক্লাস ফাইভের ছাত্র-ছাত্রী। মহিব ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সামনেই বৃত্তি পরীক্ষা। তবে, কোন্ কোন্ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিবে, তা এখনো ঠিক করা হয়নি। অথচ সবাই বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আগ্রহী। অতু তখন খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলো। মনে মনে সে ঠিক করলো, কাল স্কুলে না আসাই ভালো। মহিবের কথায় বেনীও যেনো ঘাবড়ে গেলো একটু। সে বললো, অঙ্ক করতে দিলে আমি ঠিক পেরে যাবো।

www.pathagar.com

এমন সময় ওদের চোখে পড়লো হেড স্যার এদিকেই আসছেন। তিনজনই দ্রুত ঢুকে গেলো ক্লাস রুমে। হেড স্যার রুমে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ালো। স্যার বললেন, সিট ডাউন। তারপর তিনি সবার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, আগামীকাল আমাদের স্কুলে ইন্সপেক্টর সাহেব আসবেন, তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। ক্লাসের সবাই বললো, জী স্যার। তিনি আবার বললেন, কাল তোমরা পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে স্কুলে আসবে। সেই সঙ্গে পুরনো পড়াগুলোও ভালো করে পড়ে এসো। কারণ, বরাবর আমাদের স্কুলের একটা সুনাম রয়েছে।

ছেলে-মেয়েরা বললো, জী স্যার। স্যার খুশি হয়ে বললেন, ভেরী গুড। আর একটা কথা, কেউ কিন্তু স্কুল ফাঁকি দিবে না। তিনি কিন্তু দেখবেন, কতজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কতজন উপস্থিত হয়েছে। এর উপর নির্ভর করে স্কুলের সরকারী সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপার। স্যারের কথা বলা শেষ না হতেই হঠাৎ অতু উঠে দাঁড়ালো। স্যার বললেন, তুমি কি কিছু বলবে? অতু বললো, স্যার কাল আমি স্কুলে আসতে পারবো না।

– কেন?

অতু আমতা আমতা করে বললো, কাল ছোট চাচার বাসায় যেতে হবে।

– কাল না গেলেই কি নয়?

– চাচা এসে বাসায় বসে আছেন। কাল সকালেই রওনা হতে হবে।

– ঠিক আছে। তোমার যদি খুব অসুবিধা হয়, তাহলে কাল স্কুলে এসো না।

স্যারের কথায় অতু যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মনটা তখন বেশ হালকা লাগছে ওর। স্যার আবার আগের কথায় ফিরে গেলেন। বললেন, তোমাদের একটা কথা বলা হয়নি এখনো। কাল যে ইন্সপেক্টর সাহেব আমাদের স্কুলে আসবেন, তিনিও একদিন আমার ছাত্র ছিলেন। আজ, আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। তোমরা কি গল্পটা শুনতে চাও? ক্লাসের সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো, জী স্যার। আপনি গল্পটা বলুন, আমরা শুনবো।

হেড স্যার গল্প শুরু করলেন। তিনি বললেন, একবার ক্লাসে একটা বই চুরি হয়। চুরির অপরাধ কেউ স্বীকার করলো না। শেষে সাহেদ নামের একটা ছেলের ব্যাগের মধ্যে সেই বইটা পাওয়া গেলো। ছেলেটা লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলো না। তার উপর চুরি ধরা পড়ায় খুব রাগ হলো আমার। আমি তাকে খুব মারলাম, তখন সে বার বার বলছিলো, স্যার আমি চুরি করিনি। বইটা কীভাবে আমার ব্যাগের মধ্যে এলো সে কথাও বলতে পারবো না। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না স্যার। আপনি বিশ্বাস করুন।

www.pathagar.com

তখন অবশ্য আমার একবার মনে হয়েছিল, সত্যি বুঝি ওর কোনো অপরাধ নেই। তারপর দু'দিন গত হয়, সাহেদ ছেলেটি আর স্কুলে আসে না। আমি কিন্তু পরদিনই আসল ঘটনাটা জানতে পারি। অন্য একটি ছেলে বইটা চুরি করে ওর ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলো। আমি পরদিন সাহেদের বাসায় যাই। ও এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। তখনও ওর গায়ে বেশ জ্বর। সাহেদ আমার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললো। বললো, স্যার আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। আমি বই চুরি করি নি।

আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললাম, আমি জানি তুমি চুরি করনি। তবু কেনো যে তোমাকে মারলাম। আমি দোয়া করি, তুমি বড় হয়ে প্রমাণ করে দিবে, যারা অন্যায় করে, মিথ্যা বলে, তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনটাকে মিথ্যা করে দেয়।

গল্পটা বলতে বলতে স্যারের চোখে পানি এসে গেলো। ছেলেমেয়েদের চোখও ছলছল করে উঠলো। স্যার চশমা খুলে চোখের পানি মুছে বললেন, সেই সাহেদ ছেলেটা কে, তা কি তোমরা জানো? সেই ছেলেটাই ইন্সপেক্টর সাহেদ সাহেব। কাল আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসবেন।

স্যারের কথা শেষ হতেই অতু আবার উঠে দাঁড়ালো। স্যার বললেন, অতু কি কিছু বলবে? অতু বললো, স্যার আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেন। স্যার বললেন, কেনো, তুমি আবার কী করেছো? অতু মাথা নিচু করে বললো, আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলেছি স্যার। কাল আমি কোথাও যাবো না।

– তবে যে বললে, চাচার বাসায় যাবে।

– ইন্সপেক্টরের ভয়ে।

– কেনো? তাকে ভয় পাওয়ার কী আছে?

– তিনি যদি আমাকে কোনো প্রশ্ন করেন। আর আমি যদি তার উত্তর দিতে না পারি। শুধু এই ভয়ে মিথ্যা বলেছিলাম।

– গাধা। সবাই কি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? বাসায় যেয়ে মন দিয়ে পড়তে বসবে। পড়ার সময় অন্য কোনো চিন্তা করবে না। বইকে বন্ধু ভাববে। দেখবে তখন আর কোনো কিছুই কঠিন মনে হবে না।

এর মধ্যে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠলো। স্কুলের ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করতে করতে যে যার বাসার দিকে ছুটলো। অতু তখনও স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় কমলে সে ধীরে ধীরে হেড স্যারের রুমের সামনে যেয়ে দাঁড়াল। স্যার অতুকে দেখে বললেন, কী ব্যাপার! তুমি বাসায় যাওনি? অতু মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো। স্যার

www.pathagar.com

বললেন, ভিতরে এসো। অতু ভিতরে ঢুকেই কেঁদে ফেললো। বললো, স্যার আমি আর কখনো মিথ্যা কথা বলবো না। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। হেড স্যার চেয়ার থেকে উঠে এসে অতুর মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, অতু আজ আমার কী যে আনন্দ লাগছে। এ দেশের প্রত্যেকটা ছেলেমেয়েই যদি তোমার মতো নিজের অপরাধ স্বীকার করে ভালো হয়ে যেতো, তাহলে আমাদের আর দুঃখ থাকতো না। চোখ মুছে বাসায় যাও।

অতু চোখের পানি মুছে দুর্বা ঢাকা মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো। হেড স্যার লাইব্রেরির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে বললেন, এই তো আমাদের সোনার দেশের সোনার ছেলে। একদিন এই সব ছেলেমেয়েরাই দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। ■

প্রশ্ন

১. শিক্ষকের কাছে অতু কেনো মিথ্যা কথা বলেছিল?

২. শিক্ষক ছাত্রদের কাছে যে গল্পটা বলেছিলেন– তা নিজের ভাষায় লিখ।

৩. ছুটির পর অতু লাইব্রেরির সামনে কেনো গিয়েছিল? এবং সেখানে কী ঘটেছিল?

www.pathagar.com

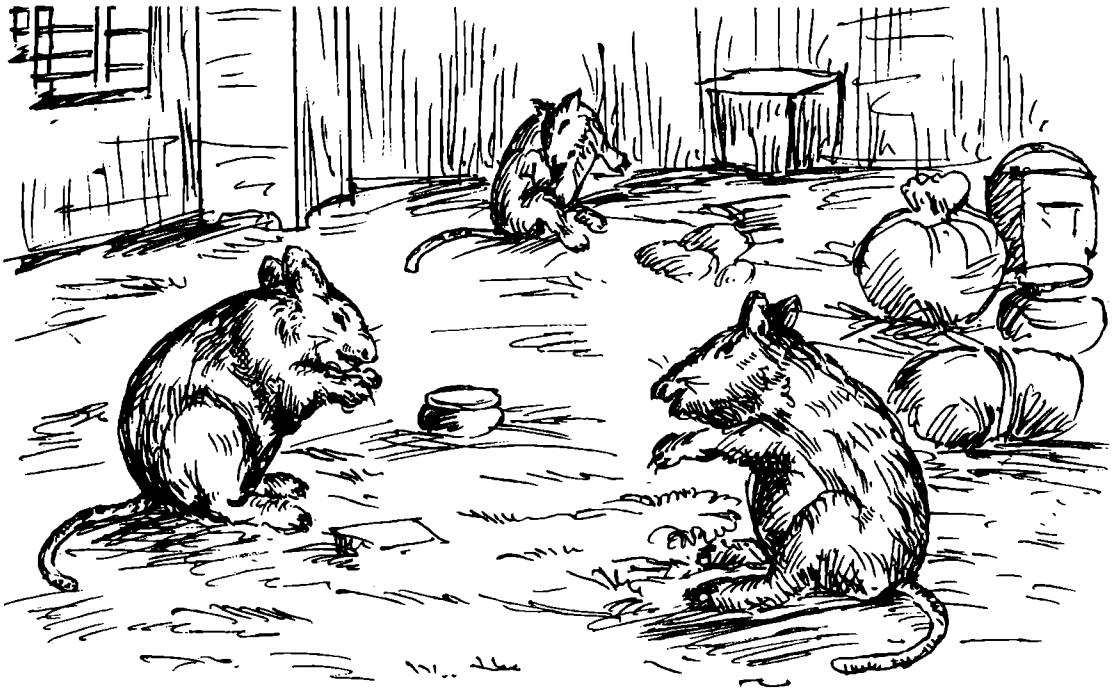

নেংটি ইঁদুরের গল্প

সাত ভাইবোনের মধ্যে এখন এক নেংটি ইঁদুরই বেঁচে আছে। বাকি ছয়টিই চলে গেছে মিনির পেটে। মিনি অর্থাৎ, তাওসিফদের কালো কুচকুচে বিড়ালটা। তা সে দেখতে যেমনই হোক না কেনো, শিকার ধরতে কিন্তু দারুণ পটু।

নেংটি ইঁদুরের বাবা-মা যখন তাওসিফদের বাসায় এসে নতুন করে ঘর বাঁধে, ঠিক তার একমাস পরই বিড়ালটা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে সেখানে। অবশ্য বিড়ালটা যেচে আসেনি। ওটাকে আনা হয়েছে। আর আনার পর থেকেই বাচ্চাটা জামাই আদর পেতে থাকে। কালো কুচকুচে বিড়ালটা খায়-দায় আর সারাবাড়ি খবরদারী করে বেড়ায়। বিড়ালটার ভাবসাব দেখে নেংটি ইঁদুরের বাবা-মার শরীর যেনো রাগে জ্বলে যায়। তবু বাচ্চারা আড়ালে আবডালে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কিন্তু মনের মধ্যে ভয়, কখন জানি কাকে ঘাড় মটকে বসে ঐ বিড়ালটা। বাচ্চাদের বাবা-মা জানে বাচ্চারা খেয়ে দেয়ে গায়-গতরে বড় হলেও বুদ্ধিতে একেবারেই ছেলে মানুষ।

www.pathagar.com

এই কালো বিড়ালটা আনার পেছনে বিশেষ একটা কারণ রয়েছে। নেংটি ইঁদুররা সাত ভাইবোন মনের আনন্দে দৌড়-ঝাঁপ, লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন দু'টি বাচ্চা ঢুকে পড়ে তাওসিফের বাবা ইব্রাহীম পাটোয়ারীর ঝুলিয়ে রাখা কোটের পকেটে। আহা কি মজার ঝুলন্ত বাসা। বাচ্চা দু'টিতো খুশিতে একবার চিৎ হয়ে শোয়– আবার ঘুর ঘুর করে ঘুরতে থাকে পকেটের মধ্যে। তারপর একটি চিঁ চিঁ শব্দে একদিন বললো, ভাই তুমি কোথায়?

তখন অন্য পকেট থেকে অন্যটি বললো চিঁ চিঁ– অর্থাৎ ভাই আমি এইখানে। আনন্দে দুই নেংটি ইঁদুর একবার পকেটের বাইরে আসে, আবার ভিতরে ঢুকে পড়ে। শেষে ওদের মাথায় এই বুদ্ধি এলো যে, পকেটের মধ্যে শুয়ে শুয়েই যাতে বাইরের সব কিছু দেখা যায়– তার জন্য পকেটে একটা জানালা কাটা খুব প্রয়োজন। ব্যস! যে কথা সেই কাজ। দেখতে দেখতে দু'জন দু'পকেটে দু'টো জানালা কেটে ফেললো। সেই ছিদ্র পথে ওরা দিব্বি আসা-যাওয়াও করতে পারে।

পরদিন সকালে ইব্রাহীম সাহেব কোট গায়ে দিতেই তার চক্ষু হলো ছানা বড়া। ছিদ্র করা পকেটের দিকে নির্বাক চেয়ে থেকে তিনি মনে মনে ভাবলেন, একি সর্বনাশ হলো তার। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো সাদা কালো– অনেকগুলো বিড়ালের বাচ্চা। তখনই তিনি রাগে গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন চৌরাস্তার হারু মোল্যার মুদী দোকানে।

ঘটনা শুনে হারু মোল্যা বললো, ভাই সাহেব ঐ কালো বাচ্চাটা নিতে পারেন। বাকী তিনটার একটা আমি রাখবো আর ও দু'টোও দু'জন চেয়ে গেছে।

পাটোয়ারী সাহেব বললেন, হারু মিয়া, আলো ছাড়া যে বিড়ালটা দেখাই যাবে না।

কি আর করা। শেষে ঐ কালো বাচ্চাটাই নিয়ে ঘরে ফিরেলেন পাটোয়ারী। তবে কয়েকদিন পরই খুশি হয়ে সবাইকে তিনি বললেন, বিড়ালটা কালো হলেও বড় লক্ষ্মী। দেখলে তো ফটাফট কেমন করে তিনটা ইঁদুরের ঘাড় মটকে দিলো।

অবশ্য এই ঘটনার পূর্বেই নেংটি ইঁদুরের বাবা-মা বাচ্চাদের সাবধান করে বলেছিলো, দেখো বাচ্চারা! খাও দাও ভালো কথা– কিন্তু এ বাসার কাপড়-চোপড় বা বইপত্রের কোনো ক্ষতি করো না। মালিকের ক্ষতি হলে কিন্তু তোমাদের আর বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু বাচ্চাদের কি আর সে কথা মনে থাকে? তারা দিন রাত নেচে বেড়ায়। নতুন দাঁতে এটা কাটে সেটা কাটে। এই করতে করতে শেষে কেটে ফেললো– তাওসিফের আব্বার

www.pathagar.com

নতুন কোট! ফলে বাড়িতে বিড়াল এলো। তারপর একে একে ছয়টি বাচ্চাই শেষ হয়ে গেলো। তখন ঐ এক নেংটি ইঁদুরটাকে কাছে রেখে বাবা-মা আবার জ্ঞান দিতে লাগলো।

তারা বললো, বাবা, বেশি সুখ চাইতে নাই। বেশি লোভ ভালো নয়। বড়দের কথা কখনো অবহেলা করতে নেই। অতি চালাকের নাকেও দড়ি পড়ে। কোনো ব্যাপারেই মাথা গরম করা ঠিক না। কথাটা মনে রেখ।

নেংটি মন দিয়ে বাবা-মার কথা শুনলো। সে মনে মনে ভাবলো, বাবা-মা তো ঠিকই বলেছে। ছোটদের মাথায় কতটুকুই বা বুদ্ধি। বাবা-মার মাথায় বুদ্ধি আছে বলেই তো তারা আজও বেঁচে আছে।

কিন্তু দু'দিন পরই নেংটি ইঁদুরের আর ভালো লাগে না। চুপচাপ কি পড়ে থাকা যায়? খেলার সাথী নেই, কথা বলার কেউ নেই, তার উপর কালো বিড়ালটার খবরদারী। ধীরে ধীরে নেংটি ইঁদুরের মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠলো। যত রাগ গিয়ে পড়লো ঐ কালো বিড়ালটার উপর। কিন্তু বিড়ালের গলায় তো আর ঘণ্টা বাঁধা যায় না। তাই মনের ঝাল মিটাতে নেংটি ইঁদুরটা তখন ইচ্ছা মতো কাটাকাটি শুরু করলো।

কলা, রুটি, মাছ, সাবান ছাড়াও কাগজ আর কাপড় কেটে একাকার করতে লাগলো। তখন বিড়ালটারও মাথা ঘুরে গেলো। কোনোভাবেই নেংটি ইঁদুরটাকে ধরতে পারে না। শেষে এমন অবস্থা হলো যে, পাটোয়ারী সাহেবের বাসা বদল করা ছাড়া আর উপায় থাকলো না। একদিন সে সবাইকে বললো, এই ইঁদুরের রাজ্যে আর থাকা যায় না। বাসা বদল করতেই হবে। এখন যদি হ্যামিলিনের সেই বংশীবাদকটা থাকতো, তাহলে আর চিন্তা ছিলো না।

পরদিনই গোজগাজ শুরু হয়ে গেলো। নেংটি ইঁদুরের বাবা-মা সব বুঝে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। স্ত্রীকে ডেকে বললো, এখনকার ছেলেমেয়েরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে চায় না। এবার দেখো কোন ঘাটের পানি কোন ঘাটে গড়ায়।

হঠাৎ নেংটি সেখানে এসে বললো, বাবা আমরা কি নতুন বাসায় যাচ্ছি?

তার মা বললো, বাছা, আগে দেখো জীবনটা বাঁচাতে পারো কি না। তারপর নতুন বাসার কথা ভাবা যাবে। মালিক ঝেড়ে মুছে মালপত্র গুছাচ্ছে। এখনই ভালো কোনো জায়গায় লুকানোর ব্যবস্থা করো। এর মধ্যেই লোকের আভাস পেয়ে যার যার মতো পালিয়ে গেলো সবাই।

www.pathagar.com

পরদিনই তাওসিফরা চলে এলো নতুন বাসায়। বাসা বদলের পূর্বে কোথাও ইঁদুরের লেজটিও দেখা গেলো না। অথচ তাওসিফের আব্বার ধারণা ছিলো যে, গোজগাজের সময় দু'চারটি ইঁদুর তো মারা পড়বেই।

সে যাই হোক, নতুন বাসায় এসে সবাই যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তাওসিফ বিড়ালটাকে আদর করতে করতে বললো, মিনি তোমাকে আর কষ্ট করে ইঁদুর ধরতে হবে না। এখন থেকে পড়া লেখা করতে হবে। মিনি বললো, ম্যাঁউ ম্যাঁউ। অর্থাৎ, ভাইয়া আমি তো পড়তেই চাই।

কিন্তু পরদিন রাতেই আবার ইঁদুরের চিঁ-চিঁ শব্দ শোনা গেলো। তখন বিড়ালটাও কান খাড়া করলো। সেও অন্ধকারে ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় থাকলো।

সেদিন তাড়াহুড়া করে নেংটি ইঁদুরটা পালিয়ে ছিলো পুরোনো জুতার মধ্যে। ওর বাবা-মা যে কোথায় লুকিয়ে ছিলো– নেংটি তা জানে না। গভীর রাতে বারান্দায় রাখা পুরোনো জুতা থেকে বেরিয়ে নেংটি তার বাবা-মাকে খুঁজতে বের হয়েছে। কিন্তু সে তো জানে না যে, তার বাবা-মা এখানে আসতে পারেনি। তারা সেই রান্না ঘরের পুরোনো

www.pathagar.com

কৌটাটির মধ্যেই রয়ে গেছে। রাতভর এ ঘর সে ঘর খোঁজাখুঁজি করে, মা-বাবাকে না পেয়ে শেষে মনের দুঃখে কাঁদলো নেংটি। মনে মনে ভাবলো, নতুন বাসায় কি মজা। মালিক হয়তো কালো বিড়ালটা আনেনি। এ সময় বাবা-মা কাছে থাকলে কতই না ভালো হতো।

কিন্তু পরদিন সকালেই খাটের পাশে আবিষ্কার হলো– নেংটি ইঁদুরটার মরদেহ। আর বিড়ালটাকে দেখা গেলো– তাওসিফের চেয়ারের উপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

তাওসিফ তখন চিৎকার করে সবাইকে বললো, তোমরা দেখে যাও, আমাদের মিনি আরেকটি ইঁদুর মেরেছে। ■

প্রশ্ন

১. পাটোয়ারী সাহেব কেনো বাসায় বিড়ালের বাচ্চা এনেছিলেন?

২. নেংটি ইঁদুরের বাবা-মা বাচ্চাদের কী উপদেশ দিয়েছিল?

৩. নতুন বাসায় যাবার পর নেংটি ইঁদুরের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল? এবং শেষ পর্যন্ত কী ঘটনা ঘটলো?

৪. এই গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি?

www.pathagar.com

বেজি ও ঘরামির গল্প

মা বেজি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। সঙ্গে দু'তিনটা বাচ্চা। বাচ্চারা এখনো বিপদ-আপদ বুঝে চলতে শেখেনি। ওদের মা সঙ্গে থাকলে ইচ্ছে মতো দৌড়ে দৌড়ে খাবার খোঁজে ওরা।

মাছিম ঘরামির বাড়ির আঙিনায় আম-কাঁঠালের গাছ। ছায়ার মধ্যে বুনো হলুদের চারা। তার মধ্যে শুকনো পাতার আবর্জনা। বাচ্চারা রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে যায় সেখানে। পাশেই ছায়ায় বসে মাছিম ঘরামি নতুন ঘরের চালা বাঁধছিলো। মা বেজি দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে চারদিকে দেখে নেয় বার বার।

গ্রীষ্মকাল। সূর্য তো নয় যেন এক খণ্ড আগুনের পিণ্ড। গরমে অতিষ্ঠ মানুষ। পশু-পাখিরাও শান্তিতে নেই। গাছের ডালে কাক ঝিমোয়। কল পাড়ের কাদায় শুয়ে লালা ঝরায় কুকুর। শরীর থেকে তাপ বের করে শীতল হয়। নীরব নিথর প্রকৃতি। দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। ঝির-ঝির বাতাসে নড়ে ওঠে পাতা-পল্লব।

বেজির বাচ্চাগুলো এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে এগিয়ে যায় কল পাড়ের দিকে। ছোট ছোট কচু গাছের ডগার আড়াল দিয়ে লুকোচুরি খেলে ওরা। মাছিম ঘরামি বাচ্চাদের

www.pathagar.com

দুষ্টমি দেখে দেখে হাসে। মা বেজি ছোট ছোট পোকা-মাকড় আর ব্যাঙ ধরে চিঁ চিঁ শব্দ করে। দৌড়ে যায় বাচ্চারা। ঘরামি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম বাঁধা-ছাঁদা করে আর ভাবে– মায়ের কোলে শিশু, দেখলেই বুকটা জুড়িয়ে যায়। সেই মা, মানুষই হোক আর পশু-পাখিই হোক। বাচ্চাদের নিয়ে সব মা-বাবারই কষ্টের শেষ নেই। আবার আনন্দেরও শেষ নেই। ঐ বেজির বাচ্চারা অবশ্য একটু বড় হয়ে নিজেরাই খেয়ে বেড়াবে। মা বেজির আর ঝামেলা পোহাতে হবে না। কিন্তু আমাদের কত ঝামেলা। ছেলে-মেয়েরা বড় হলেও চোখের আড়াল করা যায় না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাছিম ঘরামির চোখ চলে যায় কাদায় শুয়ে থাকা কুকুরটার দিকে। কুকুরটার চোখে-মুখে যেনো লোভের আগুন জ্বলছে। বাচ্চাগুলোর দিকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিকার করার ভঙ্গিতে টান টান গলা। ঘরামির বুকের মধ্যে শুরু হয় অস্থিরতা। মা বেজি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। বিপদ সংকেত জানায় বাচ্চাদের। মাছিম ঘরামি তাড় চোখে চেয়ে থাকে কুকুরটার দিকে। বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে ওঠে। তার কেনো যেন মনে হয় ওটা কুকুর নয়, বাঘ। আর বেজির বাচ্চাগুলো যেন তারই চার মাসের শিশু সন্তান। মাছিম ঘরামি ছোট্ট একটা বাঁশের লাঠি শক্ত করে ধরে মুঠির ভেতর। চোখ বড় বড় করে ধমক লাগায় কুকুরটাকে। গেলি? ঠ্যাং ভাঙবো যদি ওদিক যাস। একটুও ভয় পায় না কুকুরটা। গুড়ি গুড়ি পায়ে এগিয়ে যায় শিকারের দিকে। ঘরামি হাতের লাঠি ছুঁড়ে মারে কুকুরটাকে। বেজির বাচ্চাগুলো ছিটকে এসে আশ্রয় নেয় ঘরামির নতুন চালার নিচে। মা বেজি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখে সব।

কুকুরটা তখন রাস্তার উপর যেয়ে দাঁড়ায়। রাস্তা থেকেই ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। এগিয়ে আসার সাহস পায় না। ও যেন বুঝাতে চায় ঐ বেজিরা তোমার শত্রু। তোমার মুরগীর বাচ্চা খেয়ে সাবাড় করবে। কিন্তু তার আবেদন কোনোই কাজে আসে না। মাছিম ঘরামি রাগে দা হাতে তেড়ে যায় কুকুরটার দিকে। ওটাকে বড় রাস্তা পার করে তবেই সে ফিরে আসে।

এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে শিস দেয় মা বেজি। বাচ্চাগুলো আবার খেয়ে বেড়ায় আগের মতো। কচু গাছের ভেতর দিয়ে নালা বেয়ে পানি গড়ায়। বাচ্চারা নির্ভাবনায় সেখান থেকে পানি খায়। মাছিম ঘরামির বুকের মধ্যে প্রশান্তির ঢেউ জাগে। আর কোনো উৎকণ্ঠা নেই তার।

www.pathagar.com

গোয়াল ঘরে পাটকাঠির বেড়া। বেড়ার ওপাশে আগাছায় ভরা। মা বেজি বাচ্চাদের নিয়ে প্রায়ই এদিকে ঘোরা-ফেরা করে। কখনো বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। মাছিম ঘরামির মনে হয় বেজিটা হয়তো কাছে-কিনারেই কোথাও থাকে। তার ছেলেটা বারান্দায় শুয়ে হাত পা নেড়ে খেলা করে। স্ত্রী ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে সংসারের কাজ করে বেড়ায়। বাচ্চার চোখের সামনে দোলে রঙিন কাপড়ে তৈরি ফুলের ঝাড়। বাচ্চাটা হাত নেড়ে ধরতে চায়, আঃ আঃ শব্দ করে। রান্নাঘর থেকে মা হাসে। ছেলের সাথে গল্প করে। কখনো ছুটে এসে আদর করে যায় একটু।

গোয়াল ঘরের পাশে মা বেজি দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। ঘরামির বাচ্চাটাকে দেখে। তারপর চলে যায় রান্নাঘরের পেছন দিকে। ওদিকটায় জঙ্গল। সাপ-বিচ্ছুতে ভরা। একটা মরা গাছের শিকড়ের নিচে মসৃণ গর্তে বাস করে বেজি-দম্পতি।

দেখতে দেখতে ঘরামির ছেলেটা বসতে শেখে। বারান্দায় বসে এটা-ওটা নিয়ে খেলা করে। মাছিম ঘরামির স্ত্রী ছোট্ট উঠোনে বসে ধান ঝাড়ে। কখনো রান্নাঘরে রান্না করে। তবে খেয়াল রাখে, ছেলেটা ডোয়ার কিনারে চলে না আসে। মাছ কাটা ময়লা ফেলে দেয় রান্নাঘরের পেছনে। বেজিটা মজা করে কাঁচা মাছের আঁইশ খায়। কখনো রান্নাঘরের পাশে গাছ-গাছড়ার ভেতর থেকে ঘরামির তুলতুলে ছেলেটাকে দেখে। বেজির বাচ্চারা এখন আর মায়ের সাথে সাথে বেড়ায় না। নিজেরাই সারাদিন এ বাগান সে বাগান ঘুরে খেয়ে বেড়ায়।

একদিন বিকেল বেলা। উঠোন জুড়ে মিষ্টি গাঢ় ছায়া। একটানা ফুরফুরে বাতাস। বাচ্চাটা ঘরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ তার কান্না শুনে ঘরামির স্ত্রী রান্নাঘর থেকে ছুটে যায়। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে খেলতে দেয় উঠোনে। পরিষ্কার উঠোনে পাটির উপর বসে ছেলেটা আপন মনে খেলতে থাকে। মা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে রান্নাঘরে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে মা ছেলের সাথে কথা বলে আর তরকারী কাটে। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে মা। একটা জাত সাপ ফণা তুলে আছে ছেলেটার সামনে। ছেলেটার হাতে ছোট্ট একটা রঙিন খেলনা। সে হাত নেড়ে অস্ফুট শব্দে কথা বলছে। ছেলেটার নড়াচড়ার সাথে সাথে সাপটাও দুলতে থাকে। মাছিম ঘরামি তখন বাইরে। এ অবস্থায় স্ত্রী কি করবে কিছুই ভেবে পায় না। যদি ছেলেটাকে কামড়ে দেয়? শুধু এই ভয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে বাড়ির সবাই। কারো হাতে লাঠি আবার কারো হাতে টুকরো ইট। এমন সময় সবার অলক্ষ্যে সেই মা বেজিটা এসে দাঁড়ায়

www.pathagar.com

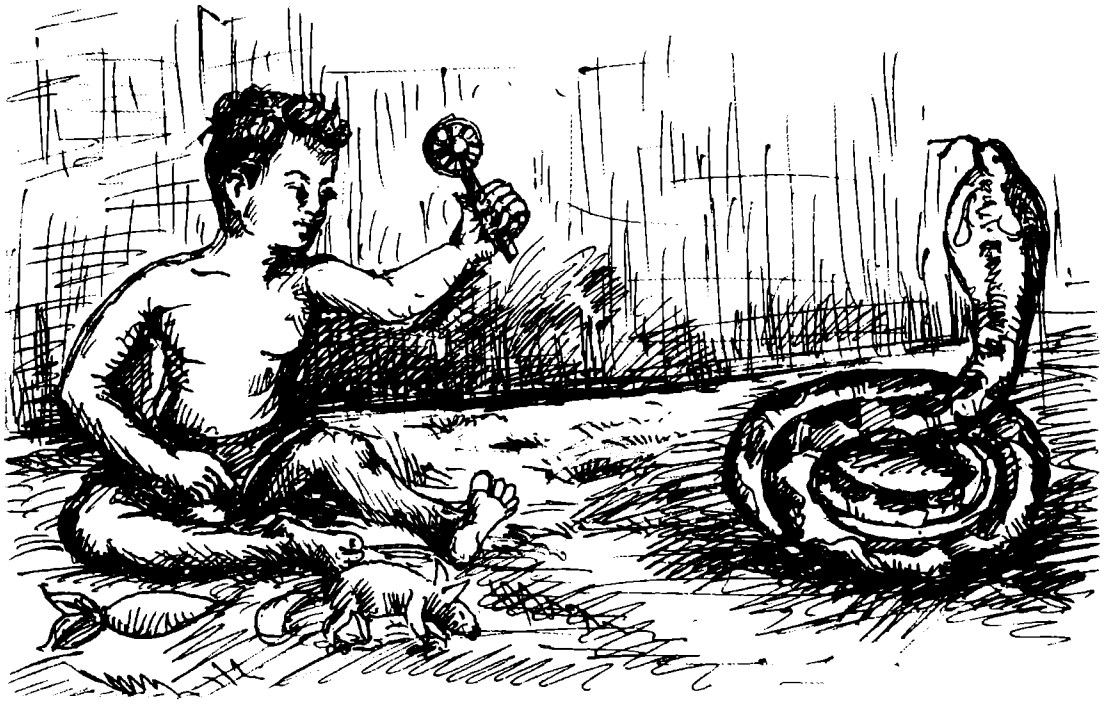

গোয়াল ঘরের পাশে। একবার শুধু দেখে নেয় সাপটাকে। তারপর সবার সামনে দিয়েই শরীরের লোম খাড়া করে এগিয়ে যায় বেজিটা। চোখের পলকে একটা লাফ দেয়। সাপটার মাজা কামড়ে ধরে ছিটকে পড়ে দূরে।

তখন উপস্থিত সবাই লাঠি হাতে সাপটাকে মারতে উদ্যত হয়। মাছিম ঘরামি রাস্তা থেকে খবর শুনে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে আসে। বেজিটা তখন কামড়ে কামড়ে সাপটাকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছে। ঘরামি অবস্থা দেখে ধমকে ওঠে! 'খবরদার! কেউ বেজির কাছে যাইও না। যা কিছু করতি হয়, তা ঐ বেজিটাই করতি পারবেনে। তোমরা দূরে খাড়ায়ে দেখো।' তখন লাঠি হাতে লোকগুলো আর তাদের সাহসের পরিচয় দিতে পারলো না। বেজিটা শেষমেষ সাপের মাথাটা ক্যাচ্ করে কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে।

সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে ছেয়ে যায় আঙিনা। উপস্থিত লোকেরা নানান গল্প করতে করতে একে একে বিদায় নেয়। মাছিম ঘরামি ছেলে কোলে নির্বাক চেয়ে থাকে জঙ্গলের দিকে। তার বুকের মধ্যে হু হু বেগে বয়ে চলে স্নেহ-মমতার ঝড়। দু'চোখ ভরে ওঠে পানিতে। আবছা অন্ধকারে সে পানি দেখতে পেলো না কেউ। সে শুধু তার স্ত্রীকে

www.pathagar.com

বললো, মালেকা, বেজিটা যদি আসে একবাটি দুধ দিও ওর সামনে। বাচ্চাগুলো এলেও কখনো ওদের শরীরে কোনো আঘাত দিও না।

কথাগুলো বলতে বলতে আবার পানি এসে যায় ঘরামির চোখে। কাঁধের গামছা দিয়ে মুছে ফেলে চোখ। ছেলেটাকে বুকের মধ্যে করে পা বাড়ায় ঘরের দিকে। মনে মনে বলে, আল্লাহ্ তোমার মহিমার বুঝি শেষ নেই! ■

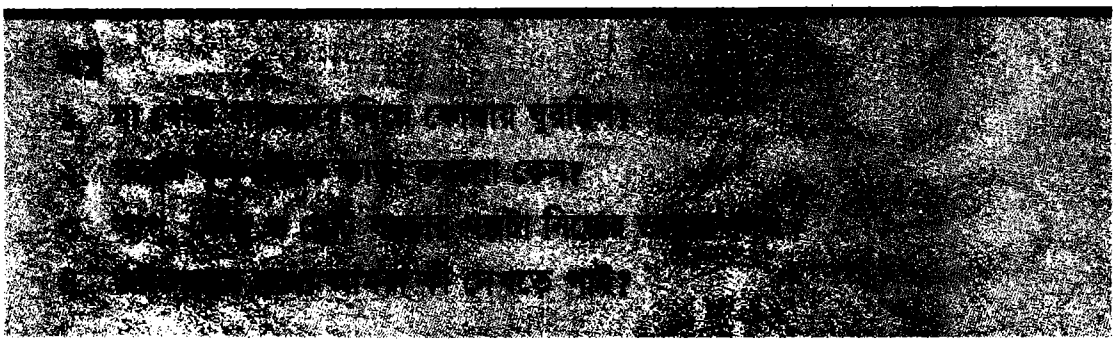

www.pathagar.com

ছবির খাতা

খাটের উপর ছোট্ট টুল পেতে লেখালেখি করেন হোসেন সাহেব। পাশেই তার চার বছরের ছেলে সামি আপন মনে ছবি আঁকে পাতার পর পাতা। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে বাবাকে ডেকে বলে, আব্বু দেখো না, কী সুন্দর ছবি! দেখো না–

হোসেন সাহেব তখন গল্পের মধ্যে ডুবে আছেন। তবু বাধ্য হয়েই গল্প ছেড়ে ছবির দিকে চোখ ফেরাতে হয়। তিনি জানেন, ছেলেকে ব্যস্ত রাখতে না পারলে তার আর গল্প লেখা হবে না। হয়তো এক্ষুণি সে হাত ধরে টানতে টানতে বলবে, আব্বু আর লেখো না, চলো ফুটবল খেলি।

এসব কথা ভেবেই বাবা বলেন, খুব সুন্দর ছবি হয়েছে। কিন্তু এটা কিসের ছবি এঁকেছ? ঠিক বুঝতে পারছি না।

বাবার কথায় ছেলে হাসতে হাসতে বলে, তুমি কিচ্ছু বোঝ না।

তারপর তার দু'বাহু প্রসারিত করে টানা টানা সুরে বলে, এটা হলো বিশাল হাঙ্গর। দেখো না কেমন হা করে আছে। এই ছোট ছোট মাছগুলো সে খাবে। তোমার কী মনে হচ্ছে আব্বু?

www.pathagar.com

হোসেন সাহেব এতক্ষণে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন, ঠিক এমনি ভাব নিয়ে বলেন, আমারো তাই মনে হচ্ছে রে বাবা! তবে হাঙ্গরের চোখ দুটো ঠিক জায়গায় হয়নি। খাতাটা দাও আমি ঠিক করে দেই।

সাথে সাথে ছেলের প্রতিবাদ।

– না, না, তুমি পারবে না। এই দেখো আমি কেমন করে চোখ ঠিক করি।

সামি যখন থেকে কলম ধরতে শিখেছে, তখন থেকেই নিজের মতো করে আপন মনে ছবি আঁকে। পাকা শিল্পীর মতো সে কলম ঘুরায় খাতার ওপর। এক জায়গা থেকে চলে যায় অন্য জায়গায়। শেষে ছবির চোখ-মুখ, লেজ আর দাঁত যেখানে যা প্রয়োজন সবই আঁকে। তার এই আঁকা-আঁকির মধ্যে ফুটে ওঠে সুন্দর সুন্দর সব ছবি। তবে ছবির ধরনটা ভিন্ন। ভাল-মন্দ সে যাই হোক, তবু সে তার ছবিতে কাউকে হাত লাগাতে দেয় না। বলে, তুমি নষ্ট করে ফেলবে। এ নিয়ে অনেক কান্নাকাটিও হয়েছে। সব ব্যাপারেই অপমান বোধটা খুব বেশি তার। সাজ-গোজের ব্যাপারেও সজাগ দৃষ্টি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাপড় পাল্টানো তার অভ্যাস।

হোসেন সাহেব ছেলেকে উৎসাহ দেন, ছবির প্রশংসা করেন। আবার পড়া-লেখার কথাও বলেন। পড়া-লেখার প্রতি ছেলের মন ফেরাতে তিনি অনেক সময়ও ব্যয় করেন। কিন্তু পড়া-লেখার কথা বললেই ছেলের মনে আর কষ্টের শেষ থাকে না। এই বিষয়টা বাবার মন থেকে তাড়ানোর জন্য সে তখন অন্য এক প্রসঙ্গ এনে দাঁড় করায়। তারপর হেসে, কেঁদে, হাত-পা নেড়ে বিষয়টাকে অর্থবহ করতে চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। পড়া লেখা যে একেবারেই করে না তা কিন্তু নয়। নিজের খেয়াল খুশিতে দু'চারটি ইংরেজী ও বাংলা বর্ণ সে সহজেই সুন্দর করে লিখতে পারে। তবে শেখানো বুলি তার ধাতে সয় না।

যাই হোক, তারপরও যদি বাবা ঐ পড়ার কথাই বলেন, তা হলে সে চোখে-মুখে অপমানের ছায়া টেনে মাকে ডাকে, আম্মু আসো তো।

অন্য ঘর থেকে মায়ের কণ্ঠ ভেসে আসে। কেনো কী হয়েছে?

– দেখো না, আব্বু কিচ্ছু বোঝে না। আব্বুকে গ্রামে পাঠায়ে দাও।

– তুমি ওখানে কী করছ?

– আমি ছবি আঁকছি।

www.pathagar.com

– তোমার আব্বু কী করছে?

– আব্বু বই বানায়।

সে জানে তার বাবার এই সব লেখা দিয়েই এক একটি বই তৈরি হয়। আর এই কথাটা সে অনেকের কাছেই বলে থাকে কথা প্রসঙ্গে। যাই হোক, ও ঘর থেকে মা এসে সব শুনে বলেন, তুমি বড় হচ্ছ, এখন থেকে তোমাকে পড়া লেখা করতে হবে। আর ক'দিন পরই তো তুমি স্কুলে যাবে।

মায়ের কথার উত্তরে সামি বলে দেয়, আমি আর বড় হব না। তুমি বড়, আব্বু বড়, আপু বড় আর আমি হলাম ছোট বাবু। আমি তো এখনো ফিডার খাই।

কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কেনোনা, সে তখনো তিনবেলা ফিডারে দুধ খায়। তাছাড়া পরিবারে একজন ছোটও তো থাকা চাই। সে কারণেই হয়তো তার আপুর বয়স আঠারো পার হওয়ার পর সে পৃথিবীতে এসেছে। তাই একটু বেশি আদর চাই তার।

যাই হোক, সামির সমবয়সী কোনো সাথি নেই বলে বাবা ও আপুই তার খেলার সাথি। বাবার কাঁধে ওঠা, বাবার পিঠে চড়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলা সামির নিত্যদিনের বিষয়।

এছাড়াও লাটিম ঘুরানো, ফুটবল খেলা, সৈন্যদের মতো লেফট রাইট করা এবং পিতা-পুত্রে রেসলিং খেলাও হয়ে থাকে মাঝে মাঝে।

আবার হোসেন সাহেব লেখালেখিতে একটু মনোযোগী হলেই হঠাৎ সামি দৌড়ে এসে বলবে, আব্বু তুমি কী লেখো– ভূতের গল্প?

– হ্যাঁ।

– কোন্ ভূতের গল্প– জটওয়ালা ভূত?

– না। কানী ভূতের গল্প।

সামি তখন দেখি দেখি বলে বাবার লেখা পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। হোসেন সাহেব মনে মনে হেসে বলেন, কেমন হচ্ছে? ছেলে বলে, ভালোই তো মনে হচ্ছে।

অবশ্য ভূতের গল্পের ভূতগুলোর নামও সামির দেয়া। যেমন– সওদাগর ভূত, কানী ভূত, ল্যাংড়া ভূত, খেংড়ি ভূত ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একথাও সত্য যে, হোসেন সাহেব তার ছেলেকে ভূত এবং পরীর গল্প শুনাতে গিয়ে চমৎকার সব গল্পের বই লিখতে

www.pathagar.com

পেরেছেন এবং সেগুলো প্রকাশও হয়েছে। আজকাল প্রকাশকেরা মৌলিক কোনো গল্পের পাণ্ডুলিপি নিতে চায় না। তারা চায় হাসির গল্প, ভূতের গল্প।

ছেলে স্কুলে ভর্তি না হলে কি হবে, তবু সে প্রতিরাতেই বাবাকে তার স্কুলের গল্প শুনায়। তামান, দিদু ছাড়াও মনগড়া আরো অনেক নামের ছেলেরাই তার বন্ধু। তাদের সাথে কি কথা হলো, কেমন করে ছুটোছুটি, মারামারি করলো, ম্যাডাম কি বললেন, এই সব নিয়ে গল্প। কথা বলতে বলতে মাথা ঘেমে ওঠে তবু কথা থামে না সামির।

সে কারণে আপু তাকে কখনো কখনো প্যাঁচাইলা বলে থাকে। সাথে সাথে আপুর বিরুদ্ধে মায়ের কাছে নালিশ হয়ে যায়। আপুর বেলায়ও একই অভিযোগ, আপু কিচ্ছু বোঝে না। আপুর সাথে আমি আর কথা বলবো না। কিন্তু সে রাগ আর কতক্ষণ। এ যে তার অভিমানের কথা। ঘুরে ফিরে সেই আপু । আপু ছাড়া যে তার এক দণ্ডও চলে না। আপুর হাতে খাওয়া, আপুর হাতে গোসল, আপুর সাথে আপুর কলেজে যাওয়া। বাবা-মা তো থাকেন অফিসে। সেই সন্ধ্যার পর তাদের কাছে পাওয়া। হোসেন সাহেব অফিস থেকে এসে একটা কিছু লেখার উদ্যোগ নিতেই ছেলে গিয়ে হাজির।

আব্বু লেখো না। আমি ছবি আঁকি, তুমি দেখো। এর উপর আর কথা চলে না। তাই, বাবা নীরবে চেয়ে থাকেন ছেলের আঁকা-আঁকির দিকে। কখনো তিনি বলেন, এই ছবিটার চোখ ভালো হলো না। সামি তার উত্তরে বলে, এটা হলো কানী ভূত।

– এই পাখিটার ডানা খুব ছোট হয়ে গেছে।

– আব্বু তুমি জানো না? আমার মেশিনগানের গুলিতে পাখির এই ডানাটা ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে!

বাঘটার দাঁত বড় করতে হবে। কেনোনা, বাঘের চারটি দাঁত বড় থাকে।

বাবার এসব কথায় সামি খুব বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। দেখো না বাঘটা বুড়ো হয়ে গেছে। হাড় কামড়াতে গিয়ে ওর দাঁত ভেঙে গেছে।

এই ব্যাখ্যার পর আর কোনো কথা বলেন না হোসেন সাহেব। হঠাৎ করেই সামির মনে পড়ে যায় আপুর কথা। তখনই সে খাতা কলম ফেলে এক দৌড়ে চলে যায় আপুর ঘরে। হোসেন সাহেব তখন কলম হাতে নতুন করে আবার ভাবতে থাকেন।

রাতে ঘুমের মধ্যে সামি হাসে, কথা বলে। সকালে ঘুম থেকে জেগেই বাবাকে স্বপ্নের গল্প শুনায়।

আব্বু, আমি স্বপ্নে দেখি কি– একটা লাল গাড়ি দিয়ে দাদা বাড়ি যাচ্ছি। পথে দেখি তামান বসে আছে।

www.pathagar.com

বাবা প্রশ্ন করেন, তামান কে?

– তামান আমার বন্ধু। তামান বলে, সামি ভাইয়া, আমিও তোমার সাথে যাব। বলো তো আব্বু, কি মুছিবতের কথা।

– মুছিবত হবে কেনো! বন্ধু যদি সঙ্গে যেতে চায়, তাহলে না করতে নেই। এবার যাও মুখ হাত ধুয়ে নাও, এক সাথে নাস্তা করবো।

– তুমি কি এখন অফিসে যাবে?

– যেতে তো হবেই।

– না– যেও না। আমি জানি, পথে মটকা ভূত বসে আছে। ওর গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ। তোমার বমি এসে যাবে।

শেষে ছেলের অনেক বায়না পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই হোসেন সাহেবের পথে নামা।

একটা মজার ব্যাপার এই যে, সামি ঘুমের মধ্যেও ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখে।

একদিন রাতে হঠাৎ সে শুনতে পেলো, কারা যেন দল বেধে দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে।

সামি ভাইয়া, দরজাটা একটু খুলে দাওনা।

নানা রকম কণ্ঠস্বর। সামি কি ভেবে খুলে দিলো দরজাটা। অমনি হুড়পাড় করে সবাই ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। এরা কিন্তু কেউই মানুষ নয়। এরা সামির আঁকা সব ছবি। তবে সবাই এখন জীবন্ত।

সামি বললো, ব্যাপার কি বলো তো। তোমরা খাতা থেকে চলে এসেছ কেনো?

বাঘ বললো, সামি ভাইয়া, আমার চারটি দাঁত বড় করে দাও। তা না হলে আমি শিকার ধরতে পারব না। গোশতও খেতে পারব না।

কানী ভূত বললো, সামি ভাইয়া, আমার বাঁ চোখটা ভালো করে দাও। চোখটা কানা বলে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

ল্যাংড়া ভূতও বললো, আমার ল্যাংড়া পা-টা ভালো করে দাও। এই পা-টা নিয়ে একটুও দৌড়াতে পারি না।

হাঙ্গর লেজ নাড়তে নাড়তে বললো, অল্প পানিতে সাঁতার কাটতে পারি না। আমার জন্য একটা সাগর বানিয়ে দাও।

www.pathagar.com

তারপর সবুজ টিয়া রাগে চোখ ঘুরাতে ঘুরাতে বললো, আমার ঠোঁট আরো লাল করে দাও। লেজটাও একটু লম্বা চাই। তা না হলে অন্য টিয়েরা কেউ আমার সাথে মিশবে না।

সবার শেষে মুখ খুলল দোয়েল। সে একেবারে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললো, সামি ভাইয়া, আমার শরীরের একী হাল করেছে তুমি। আমার এক ডানায় তো একটা সাদা পালকও দাও নি। লেজটাও করেছ যাচ্ছে তাই। আমি হলাম জাতীয় পাখি। কিন্তু এই অবস্থা দেখলে আমাকে জাতীয় পাখি বলে কেউ মানবে?

সবাই এমন কাকুতি মিনতি শুরু করলো যে, সামি আর চুপ থাকতে পারলো না। সে বললো, তোমরা সবাই আবার খাতার মধ্যে চলে যাও। আমি এক্ষুণি তোমাদের ভালো করে দিচ্ছি। তখন ওরা খুশি হয়ে আবার ঢুকে পড়ল যার যার জায়গায়। সামিও ঘর থেকে ছবির খাতাটা এনে যার যা সমস্যা আছে এঁকে এঁকে সব ঠিক করে আবার রেখে এলো খাতাটা।

হঠাৎ তার মনে হলো, দুষ্ট টিয়েটার খাঁচার দরজাটা তো বন্ধ করা হয়নি। তখনই সে চলে গেল সেই ঘরে। খাতাটা এনে মেলে ধরল চোখের সামনে। অমনি তার মুখটা কালো হয়ে গেল। খাঁচাটা ঠিকই আছে, কিন্তু খাঁচার মধ্যে টিয়েটা নেই। সামি তখন দ্রুত একের পর এক পাতা উল্টে চললো। কিন্তু কী আশ্চর্য! খাতার সবগুলো পাতা সাদা একটাও ছবি নেই। সবাই খাতা ছেড়ে চলে গেছে।

কষ্টে সামির দু'চোখ ভরে উঠল পানিতে। সামি মনে মনে ভাবল– কত শ্রম, কত যত্ন আর কত চিন্তা-ভাবনা করে ওদের আঁকলাম, ভালো করলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা ভাবল না। সবাই খাতা ছেড়ে পালিয়ে গেল! ওদের কথা ভাবতে ভাবতে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল সামি।

হোসেন সাহেব অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ছেলের কান্না শুনে দৌড়ে গেলেন ও ঘরে। সামি বিছানায় বসে কাঁদছে। দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে সমানে।

বাবা বললেন, তুমি কাঁদছ কেনো, কী হয়েছে? কাঁদতে কাঁদতে সামি বললো, আব্বু আমার খাতার সব ছবিগুলো চলে গেছে।

কথা শুনে হেসে ফেললেন হোসেন সাহেব। বললেন, ছবি কি কখনো খাতা ছেড়ে যেতে পারে?

সামি বললো, পারে। আমি যে ওদের সবাইকে ভালো করে দিয়েছি।

www.pathagar.com

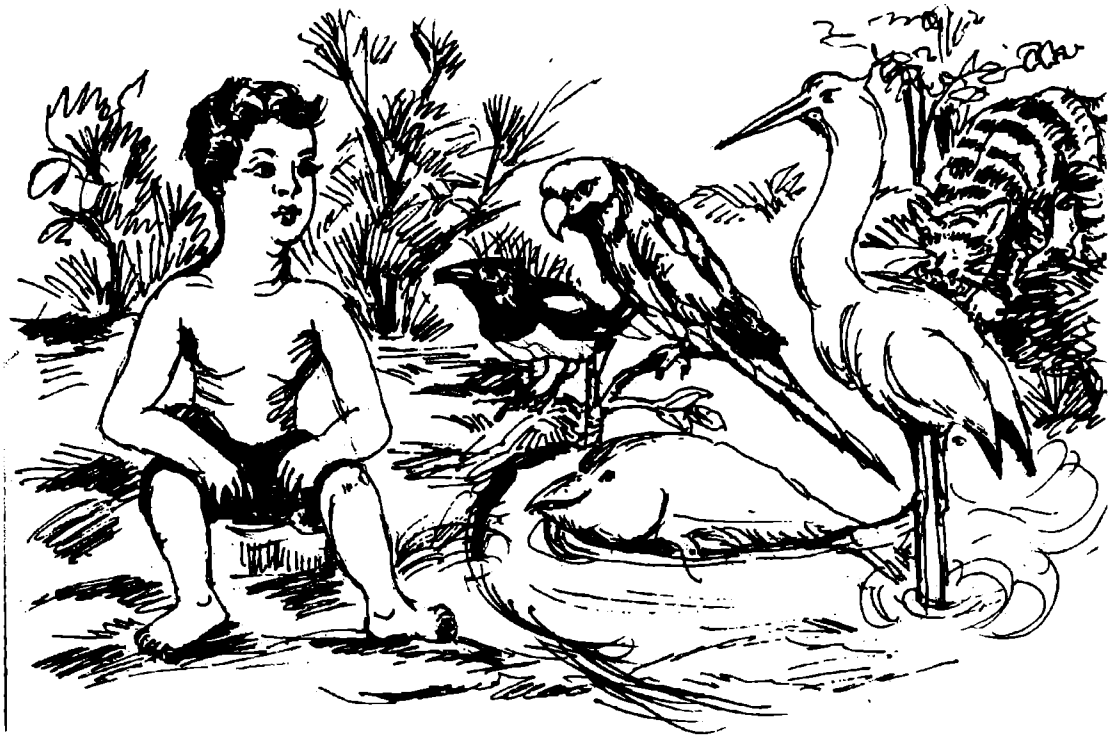

বাবা তখন হাসতে হাসতে বললেন, তুমি স্বপ্ন দেখেছ। তোমার খাতার ছবি খাতাতেই আছে। সামি বললো, না– নেই। ওরা সবাই চলে গেছে। বাবা তখন ছেলের হাত ধরে বললেন, চলো তো দেখে আসি। তবে আমার মনে হচ্ছে, ওরা হয়তো এতক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। তোমাকে ছেড়ে ওরা কি কখনো দূরে গিয়ে থাকতে পারে? ■

[illegible] বর্ণনা করো।

www.pathagar.com

খালার বাড়ি মজা ভারি

রাতে আচমকা ঢলের পানিতে ভরে উঠেছে খানাখন্দ। সকালে বৃষ্টি ধরেছে বটে, তবে সারা আকাশটা তখনও মেঘে ঢাকা। হালকা কুয়াশার মতো দিনের আলো। সূর্যের মুখ দেখার জো নেই। হঠাৎ গর্জন করে ডেকে উঠলো মেঘ। রান্নাঘর থেকে দীপুর মা চেঁচিয়ে বললো, দীপুরে, ঘর থেকে কিন্তু বের হসনে। দেয়া ডাকছে, বাজ পড়তে পারে। মন্টুকে নিয়ে কাঁঠাল আর মুড়ি খা।

ঘরের সানছেয় (চাল বেয়ে যেখানে পানি পড়ে) জমে থাকা পানির হালকা স্রোত তখনো গড়াচ্ছে ঢাল বেয়ে। সেই স্রোতে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে খেলছে দু'ভাই। মা ভিজাখড়ি চুলার মধ্যে দিয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার। ঘরভরা ধোঁয়া আর ধোঁয়া। পুরানো ছনের চালাটা এবারও ছাওয়া হয়নি। যা-ওবা একটু ভালো ছিলো তা-ও লণ্ডভণ্ড করে গেছে এবারের কালবৈশাখি।

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই ঝমঝম শব্দে আবার বৃষ্টি। দীপুর মা হাঁড়িতে ঢাকুন চাপা দিয়ে দৌড়ে আসে ঘরে।

www.pathagar.com

একি! দীপু আর মণ্টু গেলো কোথায়? মা বারান্দায় এসে গলা চড়ায়– ও দীপু, ও মণ্টু তোরা কোথায়?

কাচারি ঘরের পাশে বড় কাঁঠাল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে দু'ভাই হাসে। দীপু বলে, মা এই যে আমরা কাঁঠাল গাছের নিচে। হায় হায় করে ওঠে দীপুর মা।

বৃষ্টির পানি মাথায় পড়লে অসুখ করবে তোদের। জলদি ঘরে আয়। মুগডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ খাবি।

দীপুর মায়ের বড় ভয় মণ্টুকে নিয়ে। মণ্টু দীপুর বড় খালার ছেলে। এবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। কিন্তু অসম্ভব রকমের দুরন্ত সে। দীপু কয়েক বছরের বড় হলেও দু'ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাব। কারণ, ওদের কারোরই আপন কোনো ভাই নেই।

এই তো সেদিন গ্রাম থেকে মণ্টুর ছোট খালা অর্থাৎ, দীপুর মা ঢাকা আসা মাত্রই মণ্টু জুতা-প্যান্ট পরে এক পায়ে খাড়া। সে ছোট খালার বাড়ি যাবেই যাবে। কিন্তু এই বৃষ্টির দিনে মণ্টুর মা কিছুতেই ছেলেকে যেতে দিবে না। গ্রামে পানি-কাদার মধ্যে মণ্টুকে কে সামলাবে? মন্টুর ছোট খালা বললো, বড়বু' আম পাকতে না পাকতেই বারো ভূতে খেয়ে শেষ। আমার মণ্টুরে আমি পেট ভরে আম খাওয়াতে পারলাম না। নামি গাছে কয়টা আম আছে– ও নিজের হাতে পেড়ে খেয়ে আসবে। তাছাড়া বাগানের কাঁঠালও পেকে উঠেছে। দীপু আর কয়টা খাবে। ওরে আমি নিয়েই যাই।

সেই মণ্টুর একটা কিছু হয়ে গেলে বড়বু'র কাছে সে কী জবাব দিবে!

সে যাইহোক, হঠাৎ খালার মুখে ইলিশের কথা শুনে মণ্টুর যেনো আর তর সইছিলো না। সে বললো, ছোট খালা, ইলিশ মাছ ভাজি করেছো?

- হ্যাঁরে, ভাজি করেছি। আমি তো জানিই, আমার মণ্টু ভাজা মাছ খেতে খুব পছন্দ করে।

এইটুকু কথার ফাঁকে আবার অঝোরে ঝরতে শুরু করেছে বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় করেই একটা দৌড় লাগালো দু'ভাই। ওরা মাঝ-উঠানে আসতেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলো মণ্টু। দীপু চেঁচিয়ে বললো, আম্মা, মণ্টু পড়ে গেছে। মণ্টু পড়ে পড়ে হাসছে। চোখে-মুখে লাগছে আষাঢ়ের বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। ও হাসতে হাসতে বললো, দীপু ভাইয়া তুমিও পড় না, খুব মজা। শেষে দীপু মণ্টুর হাত ধরে টেনে তুলতে গিয়ে সেও পড়লো ধপাস করে। তখন দু'ভাইয়ের সে কী প্রাণ খোলা তৃপ্তির হাসি!

www.pathagar.com

কাণ্ড দেখে দীপুর মায়ের বুকের মধ্যে জ্বালাও করে আবার হাসিতেও প্রাণ উথলায়। কী আর করা, শেষ পর্যন্ত ভিজে পুড়ে নিজেই দু'ভাইকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো কলতলা। তারপর গোসল দিয়ে তবেই ঘরে উঠায়। কেনোনা, কলের পানিতে বৃষ্টির পানি ধুয়ে গেলে আর সর্দি লাগার ভয় থাকবে না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে, জামা-কাপড় গায়ে দিয়ে দু'ভাই বসলো জানালার ধারে। হঠাৎ মন্টুর কানে এলো কাচারি ঘরে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সুর করে ছড়া কাটছে।

কচুর পাতা মাথায় দিয়ে
বাগদী বেটা যায়,
আষাঢ় মাসে ব্যাঙের ডাকে
ঘরে থাকা দায়।

তখন মাথার উপর টিনের চালে চলছে সুরের জলতরঙ্গ। গাছের ডালে পাতার ফাঁকে পাখিরা চুপচাপ। পথ-ঘাট জনশূন্য। একটু দূরে বাঁশের ডগায় এক জোড়া ঘুঘু পাখি বাতাসে কেমন দোল খাচ্ছে। মন্টু বললো, বৃষ্টির দিনে পাখিদের খুব কষ্ট হয় তাই না ভাইয়া?

সে কথার উত্তর না দিয়ে দীপু বললো, মন্টু তুই একটা ছড়া বলতো। বৃষ্টির ছড়া। মন্টু বললো–

বাদল হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
নদে এলো বান।

দীপু বললো, এই ছড়াটা কে লিখেছে জানিস?

কেনো জানবো না– এটা রবি ঠাকুরের ছড়া।

হঠাৎ দীপু বললো, মন্টু বিলে যাবি?

– বিলে কী আছে?

– শাপলা ফুটেছে। পানকৌড়ি পানির নিচে ডুব দিয়ে মাছ ধরে। কচুরিপানার মধ্যে বাসা করে, ডিম পাড়ে।

– তুমি সত্যিই বলছো?

www.pathagar.com

– তুই যাবি?

– কখন?

– কাল। তবে মা যেন জানতে না পারে।

শেষ বিকেলে এমনই মনে হলো যে, মেঘ নিংড়ে বুঝি শেষ হলো বৃষ্টি। আকাশে তখন ছেঁড়া-ফাড়া মেঘেরা কেবলই হাওয়ার টানে ছুটছে। যেনো আবার যুদ্ধের জন্য হাঁক-ডাক করে ফিরছে। সেই ফাঁকে হঠাৎ ঝিলমিলিয়ে উঠলো সূর্যের মুখ। মন্টু ও দীপুর মুখেও ফুটলো হাসি।

রাস্তার পাশে কলমি লতার ডোবায় কালো কালো কোলা ব্যাঙ এবং ঠ্যাং লম্বা হলদে ব্যাঙেরা গলা ফুলিয়ে মেতেছে গানের প্রতিযোগিতায়।

মন্টু বললো, ভাইয়া চলো আমরা ব্যাঙ ধরি।

– চল ধরি। কিন্তু ওখানে যে সাপ আসে।

– সাপ আসবে কেনো?

– সাপরা যে ব্যাঙ খায়, তুই জানিস না?

– তুমি ব্যাঙের ডিম দেখেছো?

– হ্যাঁ। ব্যাঙের ডিম দেখতে ঠিক সাগুদানার মতো। তবে হাজার হাজার ডিম এক সঙ্গে লেগে থাকে।

– ব্যাঙের ডিম কি মানুষরা খায়?

– ধুর বোকা– তবে শুনেছি বিদেশীরা ব্যাঙ খায়।

এর মধ্যেই চারদিকে অন্ধকার হয়ে এলো। দীপুর বাবা দোকান থেকে ফিরে আসতেই দেখে দীপু আর মন্টু দাঁড়িয়ে।

– সন্ধ্যা হয়ে এলো, তোমরা ওখানে কী করছো? বাড়ি চলো। এখনই হয়তো শিয়াল আসবে।

শিয়ালের কথা শোনা মাত্রই মন্টু দৌড়ে এসে ছোটখালুর হাত ধরে বললো, ছোট খালু, তোমাদের এখানে শিয়াল আছে?

খালু বললেন, গ্রামে শিয়াল থাকে। ওরা হয়তো এখনই ব্যাঙ খেতে আসবে।

– শিয়ালতো মুরগি খায়।

– ব্যাঙ, মুরগি সবই খায়।

– তাহলে কি ওরা মানুষও খায়?

www.pathagar.com

এবার একটু বেকায়দায় পড়লেন ছোট খালু। একটু ভেবে বললেন, ওরা সুযোগ পেলে অনেক সময় খুব ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যায়। তবে, শিয়ালও ভদ্র হয়ে থাকে এই বর্ষা মৌসুমে।

– কেনো ভদ্র হয়?

– বিপদে পড়লে সবাই ভদ্র হয়। তবে এখন যে শিয়ালদের দৌড়াবার আর পথ নেই, চারদিকেই পানি। এবার ঘরে চলো। রাতে অনেক গল্প শোনাবো তোমাদের।

পরদিন সকাল বেলা আর বৃষ্টি এলো না। দু'ভাই বড় রাস্তায় গিয়ে দেখে, রাতের মধ্যে নদীর পানি বেড়ে চর ঝাঁপিয়ে এসে গেছে রাস্তার কাছাকাছি। ঘোলা পানির স্রোতও ছুটছে বেগে। মন্টু বললো দীপু ভাইয়া, শাপলা তুলতে যাবে না?

– এখনই?

– তাহলে?

– তবে চলো।

দীপুর মা সকাল সকাল রান্না শেষ করে ঘরে আসে। দুধের হাঁড়িটা রেখে দেয় চুলার উপর। হালকা তাপে সরটা কেমন থির-থির কাঁপছে। মনে মনে ভাবে, এ সর আমার মন্টু খাবে। ঢাকা শহরে কি দুধ আছে? সব চাউলের গুঁড়া গোলানো পানি। বারবাড়ি এসে দীপুর মা খোঁজে দু'ভাইকে। কোনো সাড়া না পেয়ে এগিয়ে যায় নদীর ধারে। কিন্তু সেখানেও কোনো হদিস পায় না ওদের। এদিকে বেলা বেড়েই যাচ্ছে।

উতলা হয়ে উঠে মায়ের মন। শেষে পাড়ার একটি ছেলেকে বললো, মজিবর, আমার মন্টু আর দীপুকে দেখছিস?

মজিবর বললো, চাচী, দীপু ভাইরে বিলি যাতি দেখছি।

চাচী কাকুতি মিনতি করে বললো, মজিবর একটু বিলে যাতো লক্ষ্মী। ওদের ডেকে নিয়ে আয়। তারপর পেট ভরে কাঁঠাল খাবি এসে। তুই বলবি, ঢাকা থেকে

লোক এসেছে।

– কে আয়ছে চাচী?

– কেউ না। এমনি বলবি। তাহলে ওরা জলদি চলে আসবে।

এর মধ্যে আবার বৃষ্টি এলো। পথেই মজিবরের সাথে দেখা হয়ে গেলো ওদের। মজিবর বললো, দীপু ভাই চাচী তোমাদের ডাকে।

www.pathagar.com

দীপু বললো, দেখ মজিবর কতো শাপলা তুলছি। তুই এগুলো কাঁধের উপর নে তো। আর চল, তিনজনে শ্মশান ঘাটে সড়সড়ি খেলিগে। তারপর গোসল করে বাড়ি যাবো।

দেখতে দেখতে চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে শুরু হলো বৃষ্টি। বড় রাস্তা থেকে ঘাটে যাওয়ার পথ বেয়ে গড়াচ্ছে বৃষ্টির পানি। সেই ঢালুতে তিনজনের শুরু হলো সড়সড়ি খেলা। কাদা পানিতে সবাই একাকার। তারপর কতক্ষণ নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করে তবেই দু'ভাই ফিরে এলো বাড়িতে।

দীপুর মা দৌড়ে এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, তোরা না বলে বিলে কেনো গিয়েছিলি? একটা কিছু হয়ে গেলে তখন আমি কী করবো বলতো! এদিকে বড়বু' বার বার ফোন করছে।

মণ্টু বললো, আম্মু কী বললো?

– বললো, আমার মণ্টু কোথায়– আমি তার সাথে কথা বলবো। আমি বললাম, ওরা কাচারি ঘরে খেলছে। এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

একটু থেমে দীপুর মা আবার বললো, দেখতো তোদের জন্য বড়বু'র কাছে মিথ্যা বললাম।

– ছোটখালা, আম্মুকে একটা রিং দাও না। মা যদি শাপলা খেতে চায়– তাহলে ঢাকা ফেরার সময় অনেক করে শাপলা নিয়ে যাবো।

দীপু বললো, শাপলা কি খায়?

দীপুর মা বললো, খায়। ঢাকায় যারা থাকে তারা সব খায়। মরা পচা কিছুই বাদ দেয় না।

যাই হোক, মা দু'ভাইয়ের হাতে-পায়ে গায়ে-পিঠে সরিষার তেল মেখে দিলো। তারপর মাছ, মাংস দিয়ে ভাত খাইয়ে বললো, খুব হয়েছে আর না। এবার দু'ভাই ঘুমোও। এরপর কেউ আর ঘর থেকে উঠোনেও নামবে না।

বিকেলে আবার ঢাকা থেকে রিং এলো। মণ্টুর ছোটখালা বললো, বড়বু' ওরা খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে, তুমি এতো চিন্তা করো না। আগামি সপ্তাহেই মণ্টুকে আমি ঢাকা নিয়ে যাবো।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে, তবু মণ্টুর ঘুম ভাঙে না। দীপু ঘুম থেকে উঠছে, তবে

www.pathagar.com

বারান্দায় রাখা চেয়ারটাতে বসে আছে চুপচাপ। দীপুর মা মন্টুকে ডাকতে গিয়ে চমকে উঠলো। ছ্যাঁক করে উঠলো তার বুকের মধ্যে। জ্বরে মন্টুর গা পুড়ে যাচ্ছে।

– ও মন্টু, তোর গায়ে দেখি জ্বর! ও আল্লাহ্ এ কী হলো। বড়বুকে এখন আমি কি বলবো?

মন্টু ধীরে ধীরে উঠে বসলো। চোখ-মুখ যেনো আগুনের আঁচে ঝলসানো। খক খক করে দু'তিনবার কাশিও দিলো। যেনো ছেঁড়া তবলায় কেউ দু'টো চাটি মারলো। ঠিক তখনই আবার বেজে উঠলো মোবাইল। মন্টুর মা বললেন, মন্টুর কাছে দে তো। আমি ওর সাথে একটু কথা বলি।

মন্টু মোবাইল হাতে নিয়ে কাতর সুরে বললো, আম্মু তোমার জন্য আমি শাপলা নিয়ে আসবো। খালাদের বিলে অনেক শাপলা আছে। কথা বলতে বলতে আবার একটু কেশে উঠলো মন্টু।

মা বললেন, তুমি অমন করে কথা বলছো কেনো? তোমার কি জ্বর হয়েছে? তোমার ছোট খালাকে দাও। ছোটখালা মোবাইল হাতে নিতেই মন্টুর মা বললেন, হ্যাঁরে ছোটো– মন্টুর গায়ে কি জ্বর? ও এমন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে কেনো?

বড়বু এই এখনই দেখছি ওর গায়ে জ্বর। আমাকে না বলে দু'ভাই বৃষ্টিতে ভিজেছে। তুমি চিন্তা করো না। আমি এক্ষুণি ভোলা ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাচ্ছি।

তারপর কোন পথে দিন যায় রাত আসে মন্টুর ছোটখালা তা বুঝতেও পারে না। একদিন দু'দিন করতে করতে তিন দিনের দিন ঢাকা থেকে মন্টুর মা এসে হাজির।

ছেলের মুখের দিকে তাকানো যায় না। মায়ের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়লো। মন্টুর মা বললেন, ছোটরে তুই কেনো– ওকে বৃষ্টিতে ভিজতে দিলি। তোর কাঁঠাল খেতে এসে আমার মন্টুর এ কী হলোরে ছোটো। তোদের এখানে কি কোনো ভালো ডাক্তার আছে, না ওষুধ আছে!

এর মধ্যেই বুড়ো ভোলা ডাক্তার এসে হাজির। মন্টুর মায়ের শেষের কথাগুলো তাঁর কানে এসেছে। ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, এখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, একথা তোমাকে কে বলেছে মা। তারপর মন্টুর নাড়ি টিপে, চোখ, জিহ্বা দেখে তিনি বললেন, দাদা ভাইয়ের জ্বর এই রাতেই পড়ে যাবে। কাশিটা আরো দু'দিন থাকবে। তবে বৃষ্টিতে আর ভেজা যাবে না। ও ভালো হয়ে আমার বাড়ি থেকে আম আর কাঁঠাল খেয়ে তবেই

www.pathagar.com

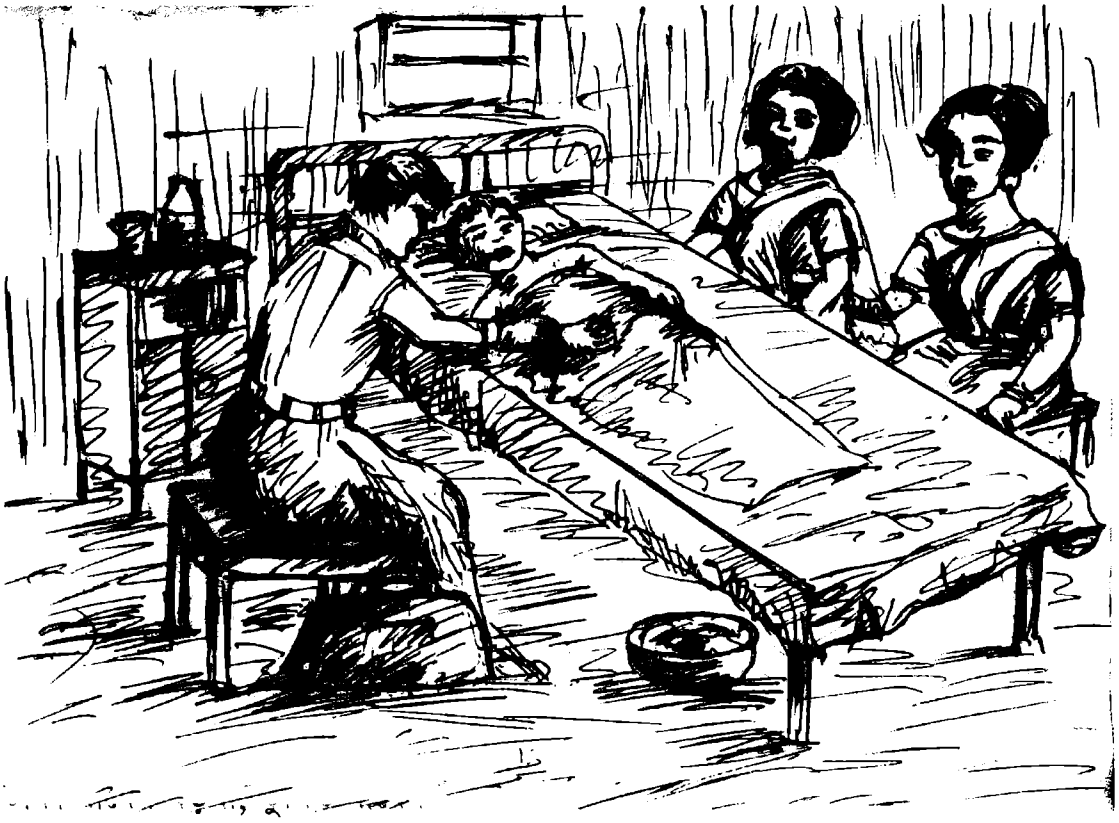

ডাক্তারের কথায় মণ্টুর মায়ের দু'চোখ ভরে পানি এসে গেলো। আঁচলে চোখ মুছে বললো, কাকা আমার মণ্টুকে ...

কেঁদো না মা। মণ্টুর কিচ্ছু হয়নি। তোমাদের বাবা নেই, আমিও হয়তো কবে চলে যাবো। তবে যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, প্রয়োজনে আমাকে জানিও। আমি যেমনই হই না কেনো, আমার ওষুধ কিন্তু ঠিক কাজ করবে। ■

প্রশ্ন

১. মণ্টুর একটি চিত্র বর্ণনা কর।

২. দীপু আর মণ্টু কেনো বিলে গিয়েছিল?

৩. জোলা ডাক্তার এসে মণ্টুর আম্মাকে কী সব কথা বলেছিল?

www.pathagar.com

নুরু মাস্টারের সংসার

নুরু মাস্টারের ছোট্ট সংসার। সেও নড়বড়ে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তবু একজন কাজের মানুষ না হলে নড়বড়ে সংসারটাও বুঝি আর দাঁড় করে রাখা যায় না। ইদানিং শহরবাসিদের সমস্যা এখানেই। সংসার ছোট বড় যেমনই হোক না কেনো, একজন কাজের মানুষ চাই-ই চাই। তা না হলে জীবন যুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রমী মানুষগুলো একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ারও সময় পায় না।

কিন্তু চাইলেই তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। এই শহরে টাকা হলে বোধকরি সব কিছুই হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব। তাই বলে কাজের মেয়ে পাওয়া যে বড় ভাগ্যের ব্যাপার। সে কারণে গ্রামে গ্রামে লোক লাগিয়ে সন্ধান করা হয় একটি কাজের মেয়ের। খোঁজাখুঁজির পর যদিও বা মেলে, সেখানেও রয়েছে সমস্যা। মেয়ে পক্ষের সঙ্গে দর কষাকষি ছাড়াও আর পাঁচজনের চোখের উপর দিয়ে যে ব্যক্তি কৌশলে মেয়েটিকে হাতের মুঠোয় আনতে পারবে, তারই হবে জয়।

এতোসব ঝামেলা পোহাবার পর মাস্টারের স্ত্রীপক্ষের এক আত্মীয় নিরেট পল্লীগ্রাম থেকে একদিন একটি মেয়েকে নিয়ে হাজির হলেন মাস্টারের বাসায়। মেয়েটির গায়ের

www.pathagar.com

রঙ এতোটাই কালো যে, কদাচিৎ এমনটি চোখে পড়ে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছালো তারা। তা না হলে প্রথম দর্শনেই ভূত ভেবে হয়তো বা কেউ চমকে উঠতো। তবু মেয়ের বাবা-মা মেয়ের নাম রেখেছে রূপা। রূপার বাবা যদিও গরীব মানুষ কিন্তু ছেলে মেয়ের দিক দিয়ে সে মোটেই গরীব নয়।

সমাজের অনেকেই বলে থাকেন, সন্তানরা ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। সন্তানের কপালগুণে ঘুঁচে যায় মা-বাবার সব দুঃখ-কষ্ট। রূপারা সাত ভাই বোন। কিন্তু রূপার বাবার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি এখনো। তবে, ভবিষ্যতে যে হবে না সে কথাই বা কে বলতে পারে। কেউ কি জানে, তার কোনো সন্তানের মধ্যে ধন-সম্পদের বীজ বপন করা রয়েছে? আবার এমনও দেখা যায় যে, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত আছে প্রচুর, কিন্তু তাদের নেই কোনো সন্তান। সে ব্যক্তি রাজা হোক, আর বাদশাই হোক, বাহ্যিক দৃষ্টির আড়ালে তিনি একজন ফকীরের চেয়েও নিঃস্ব। এদিক দিয়ে রূপার বাবা বাদশাহই বটে।

সে যাই হোক, রূপা ছোটবেলা থেকেই পাড়ায় পাড়ায় লাঠি-ঝাটা খেয়েই এতোটা বড় হয়েছে। ঝোপ-জঙ্গল ঝাড়ু দিয়ে জোগাড় করছে চুলোর খাবার। নিজেদের পেটের খাবার জুটুক আর নাইবা জুটুক। সেই মেয়ে সব ফেলে রেখে, ঢাকা শহরে বসবাসরত নুরু মাস্টারের পাঁচতলার ফ্ল্যাটে এসে উঠলো।

মেয়েটিকে দেখে-শুনে মাস্টারের স্ত্রী বললেন, সংসারের কাজ-কর্ম কিছু জানিস? নাকি পাড়ায় পাড়ায় টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার সেজে ঘুরেছিস?

মেয়েটি কিছুই বললো না। এমনকি চোখ তুলে তাকাতেও সাহস হলো না তার।

যে লোকটি রূপাকে নিয়ে এসেছে, সে বললো, আপা ওসব কথা এখন থাক। এই মেয়েই তো প্রায় ফসকে গিয়েছিলো। সন্ধ্যায় আরেক পার্টি আসবে শুনে আমি ওর মায়ের হাতে একশত টাকা গুজে দিয়ে তখনই ওকে নিয়ে আসি আমার বাড়িতে। তারপর সোজা ঢাকা। গরীব মানুষের মেয়ে, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে ঘর-সংসার ও-ই সামলাতে পারবে। কালো হলেও মেয়েটা লক্ষ্মী।

মাস্টারের স্ত্রী বললেন, তুই তো বলেই খালাস। আমরা থাকি না বাসায়, ফাঁকা ঘর। শেষে চুরি-চামারী করে পালায় যদি?

মাথা খারাপ! ওর দাদাও তো কোনদিন পদ্মা পার হয়নি। ঢাকা তো দূরের কথা। এ মেয়ে ঘর ছেড়ে কোথাও যাবে না। জোর দিয়ে বললেন আত্মীয়।

www.pathagar.com

নুরু মাস্টার চিরকালই অন্য ধরনের মানুষ। হওয়া ভাতে নাকুর দিয়ে ঘাটাঘাটি করা একদম সহ্য হয় না তার। তিনি বললেন, কালো হোক আর বেয়াড়াই হোক– শহরের আলো-বাতাস শরীরে লাগলে সব ঠিক হয়ে যাবে।। পু' বললেই তো আর পুটিমাছ মিলছে না! সরকার এখন গ্রামের মেয়েদের এতোটাই সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন যে, কাউকে আর আগের মতো পরের বাড়িতে দাসী-বাঁদীর কাজ করতে হয় না। পাওয়া গেছে সেই ঢের।

মাস্টার সাহেব তার ভাবনার মধ্যে কখনো জড়তা রাখেন না। নিজের চেয়ে অপরের দিকটাই বেশি করে দেখেন। এভাবেই এতোকাল কেটেছে, তবু কপাল খোলেনি। পরিবর্তন আসেনি ছোট সংসারে। তার ভাবনার সঙ্গে মিল নেই সমাজ-সংসারের। ফলে ঠকেছেন বার বার। তবু তার মুখ ফসকে সত্যি কথাটাই বেরিয়ে আসে সবার আগে। এটাই তার দোষ। তার উপর কোন কিছুতেই মাস্টারের লোভ নেই। ভবিষ্যতের ভাবনাও নেই। স্ত্রী বলেন, নীতিকথায় পেট ভরে না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে লোকে আপনাকে বোকা ছাড়া আর কিছুই বলবে না।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করেন অথচ তাদের অভাব সারে না। মাস্টারের ধারণা, সংসারে শনির ঘোর লেগেছে। এই শনিকে কে সামলাবে? চেনাজানারা বলেন, নুরু মাস্টারের নড়বড়ে সংসার হলেও সেখানে সুখ আছে। দু'টি মাত্র ছেলেমেয়ে। সুখের সংসার।

একথাটা কতটুকু সত্যি?

প্রতিবেশী হোক আর আত্মীয় স্বজনই হোক, দূর থেকে তারা যে সুখের কথা বলেন, সে শুধু মাস্টার সাহেবকে সান্ত্বনা দেয়া মাত্র।

মাস্টার এখন শনি তাড়াতে আঙুলে ধারণ করেছেন অষ্টধাতুর রিং। সৎ পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে অর্থ ঘরে আনেন, তা যেনো অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় হাওয়া হয়ে যায়। তিনি কেবলই ভাবেন, আমার হয়তো লক্ষ্মী ছাড়া সংসার। সংসারে অনেক কাজের মেয়েই তো আসলো আর গেলো, কিন্তু নড়বড়ে সংসার সেই আগের মতই আছে। বোধকরি তারাও ছিলো লক্ষ্মীছাড়া। তবে এই নতুন মেয়েটা দেখতে যেমনই হোক না কেনো– এর মধ্যে লক্ষ্মীর ছায়া থাকলেও থাকতে পারে।

মাস্টার অপেক্ষায় থাকলেন। এর মধ্যেই পার হয়ে গেলো ছ'মাস। সংসার অথবা নিজের জীবনের কোন ভালো দিকও তিনি খুঁজে পেলেন না এতো দিনে।

www.pathagar.com

তবে মাস্টার সাহেবের একটা বিষয় ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো যে, মাস শেষে অর্থের বড় টানাটানি। যা এর আগে কখনো এতোটা প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি।

মেয়ে কলেজে পড়ছে। ছেলের বয়স মাত্র দেড় বছর। ভাই বোনের বয়সের ব্যবধান যতো দীর্ঘই হোক না কেনো– তবু হেসে খেলে দিন কাটে ওদের। প্রচণ্ড মিল দু'ভাই-বোনের। কেউ কারো কাছ ছাড়া হয় না। শুধু এই দৃশ্যটুকুই মাস্টারের বুক ভরে দেয় শান্তিতে।

কাজের মেয়ে রূপার বয়স চৌদ্দর বেশি নয়। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সংসারের প্রায় সব কাজই ওকে করতে হয়। এই ক'মাসে সে অনেক কাজই শিখে নিয়েছে। কাপ-পিরিচ, প্লেট এবং গ্লাস থেকে শুরু করে সংসারের অনেক কিছুই নষ্ট করেছে রূপা। ভয় দেখিয়ে তাকে শাসনও করা হয়েছে। একদিন গ্যাসের আগুনে কাপড় শুকাতে দিয়ে পুড়িয়েছে এক গাদা কাপড়। এ বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে মাস্টারের মনে হয়েছে যে, এটাও এক ধরনের পরিবর্তন। পুরানো সব নিঃশেষ হয়ে হয়তো নতুনের শুভ সূচনা হতে যাচ্ছে। তিনি বললেন, যার যাবার সময় হয়ে যায় তাকে কি বেঁধে রাখা যায়?

এই কালো মেয়ের সহজ-সুলভ গ্রাম্য আচরণে মাস্টারের ছেলে কুতুন মুগ্ধ। এই বয়সেই সে বলতে পারে প্রায় সব কথা। তবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা। আর সেটাই শুনতে সবচেয়ে মধুর লাগে। সে রূপাকে বলে উপা। রূপা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কুতুনকে সঙ্গ দেয়।

কুতুন তার বড় বোনকে ডাকে রাঙা দিদি। কিন্তু এই রাঙা দিদি কখনো তার ভাইকে রূপার কাছে যেতে দিতে চায় না। কষ্ট হলেও সারাটা দিন ভাইকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আগলে রাখে। শুধু রূপা নয়, তার অপছন্দের কোনো মানুষের কাছেই সে কুতুনকে যেতে দিতে নারাজ।

একদিন হঠাৎ মাস্টারের স্ত্রী আলমারী খুলে দেখলেন, কোনো এক আত্মীয়ের দেয়া কুতুনের গলার চেইনটা নেই। একথা ভাবতে গেলেও বড় কঠিন মনে হয়। নড়বড়ে সংসার। তবু দু'এক খানা স্বর্ণের গহনা যে তাদের নেই– তা নয়। যদিও সেগুলো ছেঁড়া, ভাঙা আর ব্যবহারের অযোগ্য। তথাপি প্রযুক্তির কল্যাণে ইমিটেশনের গহনা পরেই মেয়েদের বাইরে চলাফেরা, সামাজিকতা রক্ষা করা।

গরীবের সংসার বলে কথা। এতোটুকুই কষ্টেই যেনো বুক ভেঙ্গে যায়।

চেইন কে নিয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে সবার মুখে একই উত্তর, জানি না।

– তাহলে?

www.pathagar.com

গোপনে গোপনে চলতে লাগলো খোঁজাখুঁজি। যারা বাসায় আসে-যায়, তারা সবাই নিকট আত্মীয়। তবে বেশিরভাগই মাস্টারের স্ত্রীর আপনজন। খোলামেলা সংসারে রূপার বিচরণ সর্বত্র। সে রূপাও এ বিষয় কিচ্ছু জানে না। এই খবর যখন মাস্টারের কানে এলো, তার আগে ঘটে গেছে আরো কিছু ঘটনা।

প্রায় বার বছর ধরে পাতলা এবং ভাঙা কিছু রিং-এর সঙ্গে তেতুল পাতার মতো এক টুকরো সলিড স্বর্ণ যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন মাস্টারের স্ত্রী। যদি কখনো সময় সুযোগ আসে, তখন না হয় একটা কিছু করা যাবে। কিন্তু দেখা গেলো ভাঙা রিংগুলো পড়ে আছে, নেই শুধু সেই স্বর্ণটুকু। মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

মাস্টার ঘটনা শুনে বললেন, কোথায় রেখেছিলে, ভালো করে খুঁজে দেখো।

স্ত্রী বললেন, একটা কৌটায় করে আলমারীর মধ্যে রেখেছিলাম।

– তাহলে গেলো কোথায়?

– আমার ধারণা, কুতুনের চেইন যে নিয়েছে এ কাজটিও সেই করেছে।

– যারা সব সময় এখানে আসা যাওয়া করে এবং বাসায় যারা আছে সবার কাছেই ভালো করে জানো। ওগুলোর উপর তো আর অশরীরি আত্মায় ভর করেনি যে, আলমারী থেকে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো।

– এতোকাল ফুটোগাছও নড়লো না– এখন এটা হারাচ্ছে, সেটা হারাচ্ছে। আমি কাকে সন্দেহ করবো?

শোকের ছাড়া নামলো স্ত্রীর মুখে। আলোচনা-সমালোচনায় কেটে গেলো আরো দু'দিন। শেষমেশ সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে, রূপা ছাড়া কেউ এ কাজ করতে পারে না। তবে, কিভাবে সেসব আদায় করা যায়, সেটাই বড় কথা।

একদিন সকাল বেলা আত্মীয়রা এবং দু'চারজন চেনাজানা মানুষও এসে উপস্থিত হলো বাসায়। মাস্টার বললেন, ঘটনাটা কী?

স্ত্রী বললেন, শুধু স্বর্ণ নয়, তার সঙ্গে অনেক টাকা পয়সাও গেছে। গতকালও সূচীর ব্যাগ থেকে দু'শ টাকা উধাও। এ পর্যন্ত আমারও অনেক টাকার হিসাব মেলেনি। ভেবেছিলাম হয়তো আমারই ভুল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি– সেগুলোও চুরি গেছে।

মাস্টারও ভাবলেন, আমার টাকা পয়সাও তো পকেটে, সোকেসে, আর টেবিলের উপরও পড়ে থাকে। কখন কী খোয়া গেছে সেসব নিয়ে কখনো ভাবিনি। তিনি বললেন, তা হলে এখন কী করতে চাও।

www.pathagar.com

– চাউল পড়া।

– চাউল পড়া! তা দিয়ে কি হবে?

– সদরঘাটের এক হুজুরের কাছ থেকে চাউল পড়া এনেছি। এই পড়া চাউল সবাইকে খেতে হবে। যে চুরি করেছে সে যদি খায়, তাহলে, প্রথমে তার পেট ফুলে উঠবে। তারপর রক্তবমী শুরু হবে। বেশি রক্ত বের হলে মারাও যেতে পারে। তাই বলছি, যে খাবে সে যেনো ভেবে চিন্তে খায়। আর আমাদের মধ্যে যদি কেউ নিয়ে থাকে, সে এখন চুপি চুপি দিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।

এতোক্ষণ নুরু মাস্টার অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে বললেন, চুরির দায়ে মানুষ মেরে ফেলা ঠিক হবে না। দেশে আইন আছে– অপরাধীকে পুলিশে দিয়ে দাও।

স্ত্রী বললেন, কাকে পুলিশে দিবো?

– কেনো? চোরকে....।

– কে চোর, তা বুঝবো কি করে? সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছি। কেউতো স্বীকার করলো না।

– ওসব ঝামেলা বাদ দিয়ে সবাই মিলে ভালোভাবে খুঁজে দেখো।

আসলে চাউল পড়াটা ছিলো শুধুমাত্র ভয় দেখানো। তবে অপরাধীর মন সবসময়ই থাকে দুর্বল। সেই দুর্বল মনে ঘা দিতেই মাস্টারের স্ত্রী একটু ঝাঝালো সুরে বলে উঠলেন, খোঁজাখুঁজি কী কম করেছি? কোনো কূল না পেয়েই তো এই ব্যবস্থা। মরলে চোর মরবে। ভালো মানুষ তো আর মরবে না।

হঠাৎ রূপা বলে উঠলো, খালা, আমি একটু খুঁজে দেখি। মাস্টারের স্ত্রী বললেন, এতোদিন ধরে তো খোঁজাখুঁজি করলি– আজ আবার নতুন করে কী খুঁজবি? মাস্টার বললেন, আহা, খুঁজতে চায় খুঁজুক না। নতুন কোনো জায়গায় পেয়েও তো যেতে পারে।

রূপা এ ঘর সে ঘর একটু ঘোরাঘুরি করেই চেয়ারের উপর টুল পেতে উঠে গেলো বাথরুমের ছাদের উপর। যেখানে সংসারের অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ঠাসা। রূপা সেখানে হাত ঢুকিয়ে সত্যি সত্যিই পেয়ে গেলো একটি ছোট পলিথিনের পুটুলি। তার মধ্যে অনেক জিনিসই রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কানের গহনা, চুড়ি, চেইন এবং স্বর্ণের সেই টুকরোটিও।

এখন সবার কাছে পরিষ্কার হলো যে, এই সাত-আট মাসের মধ্যে যা কিছু হারিয়েছে, সবই চুরি করেছে ঐ রূপা। কিন্তু রূপার এক কথা, সে চুরি করেনি। মাস্টার

www.pathagar.com

সাহেব বললেন, তাহলে এগুলো ওখানে গেলো কী করে? ধরে নিলাম কোনো কারণে জিনিসগুলোর পাখা গজিয়েছিলো। কিন্তু সবগুলো উড়ে উড়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকার কারণ কি? উপস্থিত মেহমান মহল থেকে বলা হলো। একে কিছুতেই বাসায় রাখা ঠিক হবে না। তবে, ওর কাছে আরও চুরির মাল রয়েছে। ও যদি সব স্বীকার করে সেসব ফেরত দেয়– ভালো। তা না হলে পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়াটাই উত্তম।

তারপর মেহমানরা একে একে বিদায় নিলেন। পুলিশের কথা শুনে রূপার ভিতরে তখন বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সবাই স্তব্ধ। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে রূপা বলে উঠলো, আমি কি চুরি করছি। ঘর ঝাড়ু দিবার যায়ে পাইছি।

মাস্টার সাহেবের স্ত্রী বললেন, ঘরের মধ্যে পেয়েছিল, কিন্তু ওগুলো তো বাইরে থেকে উড়ে আসেনি। পেয়েছিস যখন, তখন বললি না কেন? তুই তো দেখছি আসলেই চোর, তোকে আর আমার বাসায় রাখবো না আমি। মাস্টার বললেন, আমরা ঘরে থাকি না। যখন যেটা প্রয়োজন সবই তোকে দেয়া হচ্ছে, তাহলে চুরি করতে গেলি কেনো?

রূপার মুখে কোনো উত্তর নেই।

মাস্টার সাহেবের মেয়ে সূচী বললো, যা হবার হয়েছে। এখন সব সত্যি কথা বলো এবং প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনো এমন অন্যায় করবে না। তাহলে এখানে থাকতে পারবে। তা না হলে তোমাকে কালই– দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

অনেক কথা খরচের পর রূপাই স্বীকার করলো যে, সে দেশে যাওয়ার সময় কোমরে গুজে অনেক কিছুই নিয়ে গিয়েছিলো।

এবার মাস্টার সাহেব বললেন, রূপার কাছে অনেক টাকাও রয়েছে। টাকা পয়সা নিয়ে প্রশ্ন তুললে রূপা বললো, টাকা পয়সা নিয়ে আমি কি করবো। টাকা পয়সা দেখলে আমি সবসময়ই তুলে রাখি।

মাস্টার বললেন, কোথায় তুলে রাখিস?

কোনো উত্তর নেই।

মাস্টার সাহেব আবারো বললেন, সেগুলো বের করে দু'দিনের মধ্যেই ফেরত দিবি। তা না হলে খুব কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরদিন মাস্টার সাহেবের স্ত্রী তার অফিস ব্যাগের মধ্যে দশ, বিশ এবং পঞ্চাশ টাকার নোট মিলিয়ে তা প্রায় ছ শ' টাকার মতো পেয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

এর মধ্যে মাসও প্রায় শেষ। মাস্টারের হাতে স্কুলে যাবার পয়সাও নেই। স্ত্রীকে বললেন, লক্ষ্মীর দৃষ্টিই বলো আর ভূতের কারবারই বলো কিছু টাকা তো পেয়েছো। তার থেকে আমাকেও কিছু দাও। এসব কথা বলতে বলতে তিনি ব্যাগ খুলে টিফিন বক্স রাখতে গিয়ে দেখলেন দু'টি একশত টাকার নোট তার ব্যাগের ভিতরে। স্ত্রীকে বললেন, টাকা লাগবে না।

– কেনো?

– ভূত আমার ব্যাগটাতেও কিছু রেখে দিয়েছে।

– তার অর্থ?

– অর্থ ঐ একটাই।

তারপর সবার মনে এই ধারণা হলো যে, লজ্জা থাকলে, রূপা আর কখনো এমন কাজ করবে না। কিন্তু এতো কিছুর পরও রূপা সাত দিনের মাথায় সূচীর ভ্যানিটি থেকে আবার দু'শ টাকা চুরি করলো। কয়েক দিন পর মাস্টারের মানি ব্যাগ থেকে আবার একশত টাকা গায়েব। মাস্টার সাহেব অবাক হয়ে ভাবলেন, লোভ মানুষকে সত্যিই নির্লজ্জ করে দেয়। সংসারের এতো সব নেই নেই-এর মধ্যে তিনি চেপে গেলেন তার টাকার কথাটা।

এতো কিছুর পরও নুরু মাস্টারের চোখে রূপা শুধু গ্রামের পাতা কুড়ানো, কালো, বেয়াড়া মেয়েটিই নয়। অথবা সে চোর এবং নির্লজ্জ এটাও নয়। মাস্টারের নড়বড়ে সংসারে ওর আরো একটি পরিচয় আছে। রূপা মাস্টার সাহেবের দেড় বছরের ছেলে কুতুনের অকৃত্রিম নির্ভেজাল একজন খেলার সাথী। তা যে তার কত বড় পরিচয় তা শুধু মাস্টারই জানেন।

কুতুন রূপাকে উপা বলে, কখনো আপা বলে। সুযোগ পেলেই কুতুন রান্না ঘরে গিয়ে রূপার কাছে বসে। রূপার সঙ্গে দুষ্টুমিতে মেতে উঠে। রূপার নির্ভেজাল গ্রাম্য খেলায় যেনো প্রাণ ফিরে পায় কুতুন। সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। ঘুম না এলে কুতুন খাট থেকে নেমে রূপার বিছানার পাশে বসে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাও। সে বলে উপা যাই। কখনো রূপা কাজে থাকলে, কুতুন বলে, উপা আস না, উকাই। অর্থাৎ রূপা এসো, লুকোচুরি খেলি। রূপার সান্নিধ্যে গেলে কুতুন সব কান্না ভুলে যেনো আনন্দের এক দূরন্ত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসে। চোখে থাকে না ঘুম, পেটে থাকে না ক্ষুধা।

www.pathagar.com

এই পরিচয়টুকুর মধ্যে কোনো খাদ নেই, এখানে নেই কোনো লোভ। এ শুধু অন্তরের আলোয় ভরা দু'জনার এক আনন্দ-ভুবন। নুরু মাস্টারের বুকের গভীরে পাখি-ডাকা মিষ্টি সকালের মতো ভাসতে থাকে এসব দৃশ্যগুলো।

স্বজন ছেড়ে রূপা এই যে অনেক দূরে, অন্যের আশ্রয়ে খাঁচার পাখির মতো কৈশোরের সোনালী দিনগুলো পার করে দিচ্ছে, সে কোন্ শক্তির বলে? শত বাধ্যবাধকতার মধ্যেও ওর মন একটু খানি নিজস্ব আঙিনা চায়। সেখানে থাকবে না অন্যের শাসন। ছোট্ট কুতুন ওকে দিয়েছে সেই আঙিনাটুকু।

দিন যায়, মাস যায়, বিচিত্র বাংলার মতো মানুষের মনও পাল্টায়। সবার ভাবনার আড়ালে রূপার মনটা যে কখন পালটে গেছে, তা সে নিজেও জানে না। একদিন ও কিছু টাকা, পুতির মালা, কানের দুল ইত্যাদি নিয়ে মাস্টারের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললো, খালা এসব আমার কাছে ছিলো। এবার আমায় বাড়ি পাঠায়ে দেন। বলতে বলতে রূপার দু'চোখ ভরে উঠলো পানিতে।

খালা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, যেতে চাস যাবি। কিন্তু একটা কাজের মানুষ না পাওয়া পর্যন্ত তোকে থাকতে হবে। রূপা কিছু বললো না। এদিকে নতুন মেয়ের জন্য আগেই গ্রামে খবর পাঠিয়েছিলেন মাস্টারের স্ত্রী। দু'দিন যেতে না যেতেই নতুন মেয়ে এসে হাজির হলো ফ্ল্যাটে।

এবার রূপার বিদায় নেয়ার পালা। বুকের মধ্যে যেনো একটু কেঁপে উঠলো ওর। মুখখানা হয়ে যায় রোদে পোড়া শুটকী মাছের মতো। থেমে যায় হাতের কাজ। অনড় বসে থাকে রান্না ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

নতুন মেয়েটা দেখতে সুন্দর। সবাই খুশি। ড্রইং রুমে আলোচনা চলছে মেয়েটাকে নিয়ে। এদিকে কুতুনের কথা কারোর মনেই নেই। মাস্টার সাহেবের স্ত্রী এমনই যে, সন্তানদের জন্য তার নেই কোনো আকুপাকু। যেনো প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেয়া। কোনো কিছু না ঘটা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন।

ইদানিং কুতুন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় নিচে। উঠে যায় ছাদে। সুযোগ পেলেই চুপি চুপি ঢুকে পড়ে বাথ রুমে। হঠাৎ যখন কুতুনের কথা খেয়াল হলো, তখন সবাই এ ঘরে সে ঘরে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। কিন্তু কোথাও কুতুন নেই। এক সময় দেখা গেলো

www.pathagar.com

রান্না ঘরের এক কোণে বসে কুতুন আর রূপা মুকাভিনয় করছে। হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলছে আর ছোট ছোট করে হাসছে দু'জনেই। মাকে দেখে কুতুন বিরক্ত হয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বললো, যাও-যাও।

পরদিন গ্রাম থেকে আসা লোকটার সঙ্গে রূপা ফিরে যাবে গাঁয়ে। ঠিক যাবার মুহূর্তে রূপা বললো, আমি যাবো না। মাস্টার সাহেবের স্ত্রী বললেন, যাবি না মানে? চোর মেয়েকে আমি আর বাসায় রাখবো না।

রূপার মুখে কোনো কথা নেই। কেবল ওর উদাস দু'টি চোখ, কাকে যেনো খুঁজে ফিরছে। কুতুন তখনও বিছানায় ঘুমিয়ে। মাস্টার সাহেব বললেন, একে তো কালো মেয়ে, তার উপর গরীব। দোষ ত্রুটি তো থাকবেই। ভালো হওয়ার সুযোগ দিলেই ওরা ভালো হতে পারে। তাছাড়া ছেলেটার কথাও তো একবার ভাবতে হবে।

কিন্তু কোনো কথাতেই আর কাজ হলো না; বরং সবার তাড়াহুড়া লেগে গেলো রূপাকে বিদায় দেয়ার জন্য। যদি কুতুন জেগে ওঠে, তখন আরেক ঝামেলা। রূপা ওড়নায় চোখ মুছতে মুছতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

আরও ঘণ্টা খানেক পর ঘুম ভাঙলো কুতুনের। প্রতিদিনের মতো খাট থেকে নেমে সে দৌড়ে গেল রান্না ঘরে। দরজা ধরে উঁকি দিয়ে বললো, উপা কি করো? নতুন মেয়েটি হাতের কাজ রেখে মুখ ঘুরালো। রূপার জায়গায় অন্য মেয়েকে দেখে চুপ করে গেলো কুতুন। সে আর ভিতরে ঢুকে বসলো না পিঁড়ে পেতে। ফিরে গেলো আব্বুর কাছে।

– আব্বু উপা কই?

– উপা চলে গেছে।

– আমি যাবো।

শুরু হলো কুতুনের কান্না। কোথাও যাওয়ার কথা হলেই সে তার কাপড় আর দু'তিন রকমের দু'তিনটা জুতা নিয়ে উদোম গায়ে দরজার দিকে রওনা হয়। আজও সে সব কিছু গুছিয়ে মাস্টার সাহেবের হাত ধরে বললো, চলো না!

– কোথায়?

- উপা দাই। আসনা, আসো।

– উপা ওর মায়ের কাছে গেছে, আবার আসবে।

www.pathagar.com

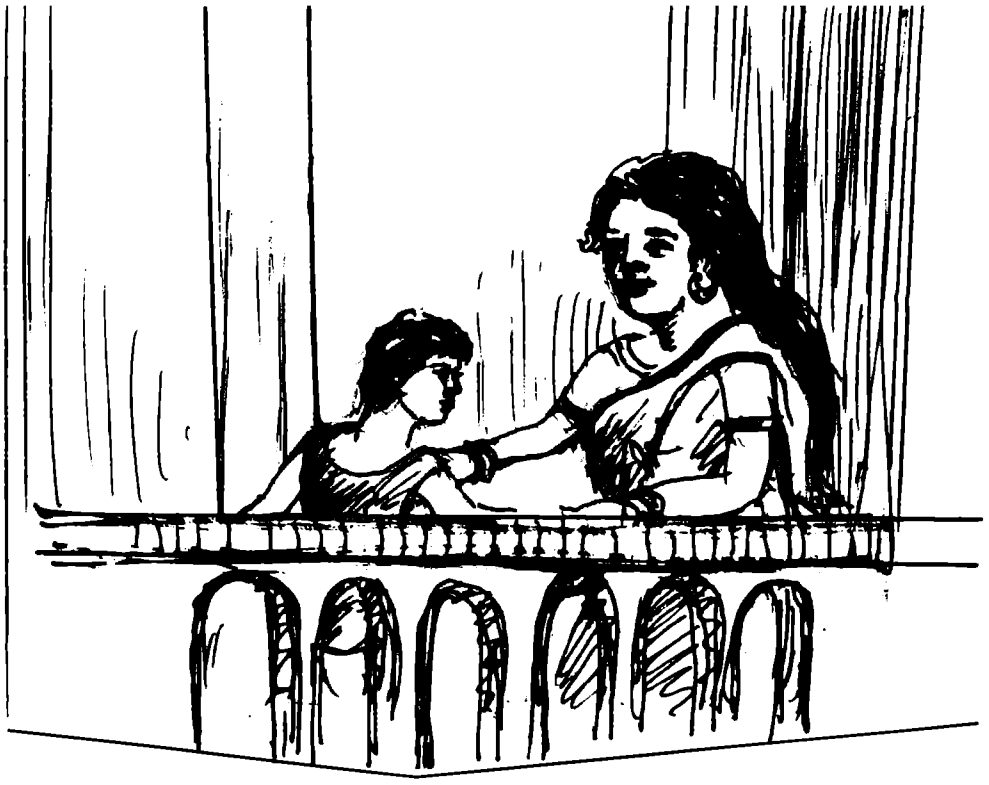

কিন্তু কুতুন নাছোড় বান্দা। সে যাবেই রূপার কাছে। চিৎকার করে কেঁদে বললো, উপা আসনা। উপা।

মাস্টার সাহেব বেলকনিতে বসে ভাবতে লাগলেন, এই সংসারের সবাই সবার দিকটা দেখলো। কিন্তু যার জন্য এই নড়বড়ে সংসারে কাজের মানুষ রাখা, তার কথাটা কেউ একবারও ভাবলো না। একবারও বুঝতে চেষ্টা করলো না তার মনের কষ্ট। কি জানি, কত দিনে ঘুচবে ওর কষ্ট ভরা ব্যাকুলতা। কতদিনে কুতুন ভুলতে পারবে কালো মেয়ে রূপার কথা, রূপার স্মৃতি। ■

প্রশ্ন

১. রূপা দেখতে কেমন এবং তার চরিত্র বর্ণনা কর।

২. নুরু মাস্টারের স্ত্রী চোর ধরার জন্য কী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন?

৩. রূপার বিদায় নেবার দৃশ্য এবং কুতুনের মনের অবস্থা বর্ণনা কর।

www.pathagar.com

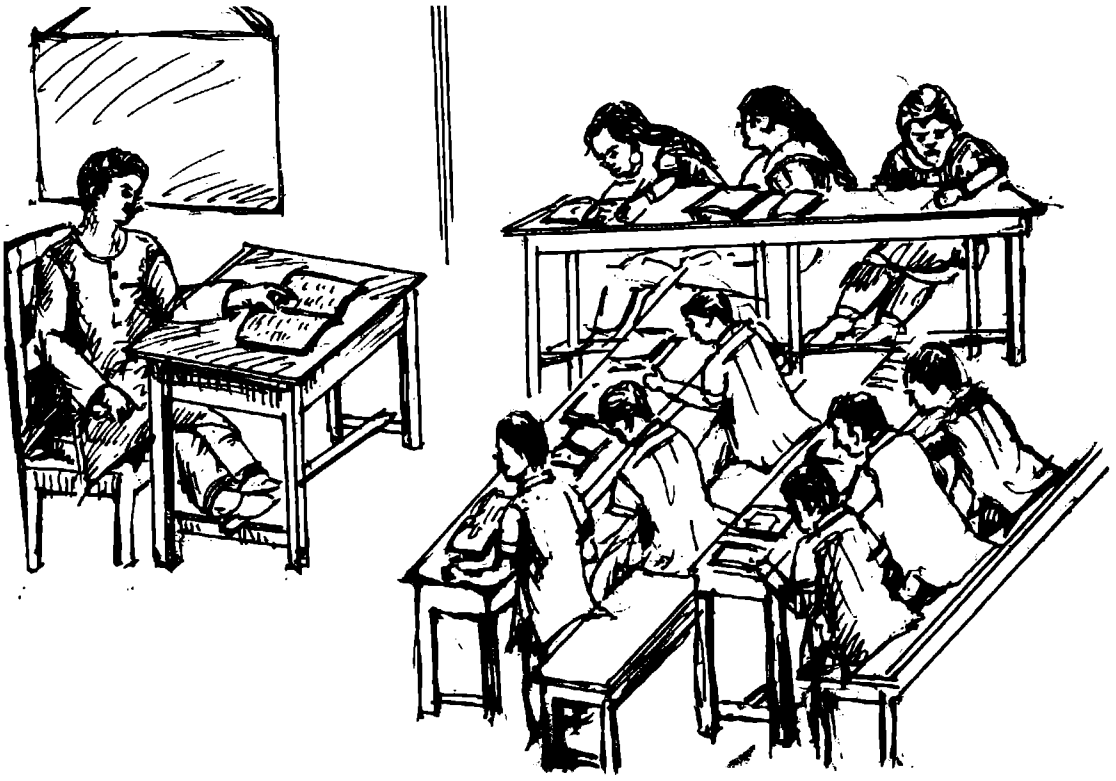

ফোর মাস্টার

নুরুদ্দিনের মাথার মধ্যে অন্ধ উঁইপোকার মতো নড়েচড়ে ওঠে ইচ্ছাটা। তখনই নুরুদ্দিন বেরিয়ে আসে ক্লাস রুম থেকে। লম্বা বারান্দায় দাঁড়ায় শালকাঠের খুঁটি ধরে। গভীর আগ্রহে চেয়ে থাকে পথের দিকে। যে পথে তার ফোর মাস্টার আসবেন স্কুলে।

পুকুরের দক্ষিণ পাড়টা ডেফল, খেজুর আর লাটিম গাছে ভরা। তারই ভেতর দিয়ে আঁকা বাঁকা পায়ে চলার পথ। পথটা শেষ হলেই খোলামেলা দুর্বাঢাকা প্রাঙ্গণ। সামনে প্রাইমারি স্কুল। স্কুল, তবে ঘরটা জমিদারের কাচারি। স্কুল ঘর ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে। যতদিন আগের জায়গায় নতুন স্কুল ঘর তৈরি না হবে, ততদিন অস্থায়ীভাবে স্কুলের কাজ চলবে এখানে। ইংরেজী অক্ষর এল-সাইজের টিনের ঘর। মেঝে পাকা, টিনের বেড়া। কাচারি ঘরের সঙ্গে লাগোয়া সানবাঁধা পুকুর। জমিদার চলে গেছেন সেই কবে। এখন এটা বাড়ির মালিক স্বনামধন্য পীর সাহেবের মুরিদানদের বিশ্রামাগার।

www.pathagar.com

এক সময় নুরুদ্দিনের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। ঐ তো ফোর মাস্টার আসছেন। মাস্টারের গায়ে হালকা নীল রং-এর হাফহাতা লম্বা শার্ট। মাথায় ছোট ছোট পাতলা চুল। যেনো পলি মাটিতে নতুন গজানো দুর্বা ঘাস। মুখটা গোলগাল, তবে নুরুদ্দিনের কাছে বড় কৈ মাছের মাথার মতো মনে হয়। সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাস্টারের দিকে। মাস্টারের পরনে চেক লুঙ্গি। খালি পা। হাতে কাঠের বাটওয়ালা ছাতা এবং একটা নিড়ানী। কখনো কখনো চার ইঞ্চি লম্বা বাট লাগানো টেংগিও থাকে। অন্য হাতে লুঙ্গির কোঁচা টেনে ধরে আছে উপরের দিকে। হাঁটার ভঙ্গিটাও অন্য রকম। প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে শরীরটাও একটু মোচড় দিয়ে ওঠে। গালভরা পান। পানের রাঙা রস ঠোঁটের কিনারে এসে ঢেউ খেলছে। কিন্তু গড়িয়ে পড়ছে না। কখনো যে পড়ে না তা নয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তার জামা কাপড়ে লেগে রয়েছে অসংখ্য লাল দাগ।

ফোর মাস্টার সরাসরি স্কুলে না ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান পুকুরে। ডোবা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাত-পা ধুয়ে নেন। সেই সঙ্গে গাল ভরা পান-সুপারির চর্বিত ছাবা ফেলে দেন পানিতে। কুলি করেন কয়েকবার। কুলি করাও এমন যে, মুখের পান বাষ্পের আকারে ছড়িয়ে দেন শূন্যে। তাতে করে সূর্যের আলোয় সৃষ্টি হয় রংধনুর। তারপর ঝুলপকেট থেকে টেনে বের করেন ভাঁজ করা লাল গামছা। হাত-মুখ মুছে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকেন। নুরুদ্দিন ফিরে আসে ক্লাসে। বেঞ্চে জায়গা দখল নিয়ে কখনো সে হৈ-চৈ করে না। বলার চেয়ে লেখার বিষয় হলে মজা পায় বেশি। কারণ, সে তো সবই জানে। লেখার মধ্যে কোনো জড়তা বা লজ্জা থাকে না। খাতাটা শুধু শিক্ষকই দেখবেন। ভালো-মন্দ বিচারও করবেন তিনি। কিন্তু কিছু বলতে গেলে খুব লজ্জা লাগে তার।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র নুরুদ্দিন। ক্লাসে দশ-বারোজন ছেলেমেয়ের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে। নাম নূরজাহান। মেয়েটি স্বভাবে একটু দুরন্ত। শুধু ছুটোছুটি, হৈ হুল্লোড়ই নয়, মার্বেল খেলাতেও সে সবাইকে হার মানায়। স্কুলে এবং পাড়ার ছেলেদের সাথেও নুরজাহান মার্বেল খেলে সমানতালে। ব্যাপারটা নুরুদ্দিনের কাছে ভালো লাগতো না। একদিন সে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে, মেয়েটি যেখানে বসে সেই জানালার পাল্লায় লিখলো "তুমি আর কখনো ছেলেদের সাথে মার্বেল খেলা করো না।"

পরদিন নুরুদ্দিন আর স্কুলে গেলো না। জানালার লেখাটা শুধু মেয়েটির চোখেই পড়লো না, ছেলেরাও দেখলো এবং শেষ পর্যন্ত ফোর মাস্টারও দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

www.pathagar.com

লেখাটা মেয়েটির সিটের পাশের জানালায়। এটা মস্তবড় অপরাধ। এমন কাজ কে করলো, কার হাতের লেখা, এ নিয়ে গবেষণা চলতে লাগলো ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্যে। অপরাধীকেও সনাক্ত করে ফেলা হলো। এ কাজ নুরুদ্দিন ছাড়া কেউ করেনি। মেয়েটি কিন্তু লেখা দেখেই বুঝতে পেরেছে, এটা নুরুদ্দিনের কাজ। মনে মনে সে লজ্জাও পেয়েছে। এ বিষয়ে তার কোনো অভিযোগ নেই।

কিন্তু ফোর মাস্টারের মনে অন্য চিন্তা। স্কুল বলে কথা। এখানে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর বেয়াদবি মস্তবড় অপরাধ। তাই নুরুদ্দিনকে সাজা পেতেই হবে। দু'দিন পর নুরুদ্দিন স্কুলে এসে জানলো, লেখাটা শুধু মেয়েটির চোখেই পড়েনি, ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও মেয়ের গার্জিয়ান পক্ষও দেখেছে। স্কুলের ছেলেরা বললো, ফোর মাস্টার খুব ক্ষেপে গেছে, তোমাকে আজ পিটাবে। এ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জনও শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছে নুরুদ্দিনের কত বড় সাহস যে, সে নূরজাহানের জানালায় আজে-বাজে কথা লেখে! কেউ বলছে, ফোর মাস্টার ওকে একশত বেত মারবে। কেউ আবার অনেক হিসাব-নিকাশ করে বলছে, একশত না হলেও কমপক্ষে পঞ্চাশটি বেত তো মারবেই।

একটা কিছু হতে যাচ্ছে, এ নিয়ে স্কুলের সব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই ব্যস্ততা আর ছটফটানি। এরা সব সময়ই শিক্ষকদের দলে থাকে, কেউ অপরাধী হলে, তার পক্ষে আর কেউ থাকে না। এ বিষয়ে নুরুদ্দিনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। তবে, তার ভেতরটা যেনো বাতাসে ভাসা বেলুনের মতো হয়ে গেলো। নিজের কিছুই করার নেই, যা হবার হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না নুরুদ্দিনের। তাতে করে একটু হতাশ হলো অন্য ছাত্ররা। এর মধ্যে হেড স্যার নুরুদ্দিনকে একবার ডেকেছিলেন লাইব্রেরিতে। তিনি বলেছিলেন, জানালায় কি তুমি লিখেছো?

– জি স্যার।

– কেনো লিখলে?

– ও যা করে বেড়ায়– সেটা আমার ভালো লাগে না। লোকেও অনেক খারাপ কথা বলে।

স্যার আর কোনো প্রশ্ন না করে বলেছিলেন, তুমি যাও।

নূরজাহান বড় ঘরের মেয়ে। তার এই দৃষ্টিকটু কাজগুলো সবাই দেখেছে, কিন্তু কেউ

www.pathagar.com

কখনো তাকে নিষেধ বা ভালোভাবে চলাফেরার জন্য কোনো উপদেশ দেয়নি। মেয়েটির গার্জিয়ান পক্ষ বলেছেন, নুরুদ্দিন এমন কোনো খারাপ কাজ করেনি যে, সে সাজা পাবে। যে কাজটি শিক্ষকদের করা উচিত ছিলো, তা করেছে ঐ নুরুদ্দিন।

ফোর মাস্টারের বাড়ি ঐ গ্রামেই। স্কুল থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে হবে হয়তো। মাস্টার সাহেবের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আলো যতোটাই থাকুক না কেনো– তার চেয়ে ঢের রয়েছে গোঁয়ারতমি। তার চিন্তার মধ্যে আরেকটা ব্যাপার এসেছে যে নুরুদ্দিনকে সাজা দিলে মেয়ের গার্জিয়ান পক্ষ তাকে ভালো বলবে। কিন্তু ফোর মাস্টার শেষে নিজেই বোকা বনে গেলেন। তিনি সামান্যই লেখাপড়া জানতেন। পাঠ্য পুস্তকে যা আছে তার বেশি তিনি ভাবতে পারতেন না। তবে একটা বিষয় তিনি খুব ভালো বুঝতেন। শিক্ষক ছাত্রদের শাসন করবে। আর শাসন করতে গেলেই বেতের প্রয়োজন। টেবিলের উপর সপাৎ করে একটা বাড়ি দিয়ে কচি কচি প্রাণগুলোকে চমকে দিতে পারলেই শিক্ষকের সার্থকতা। ভয়ে ছেলেমেয়েদের বুকের মধ্যে ধুক ধুক করবে। তিনি যা বুঝাবেন, সেটাই হবে চূড়ান্ত।

কখনো তিনি যদি বলেন, ভালো দেখে একটা বেত কেটে আনিস তো তোরা। ব্যস, ছাত্রদের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো মহা হুলস্থুল কাণ্ড। তখন বেত বাগানেরও অভাব ছিল না। যেখানে সেখানে বেতের ঝাড়। স্যারের এই আদেশের জন্য ছেলেরা যেনো কতকাল ধরে অপেক্ষা করছিলো। তাদের মনের মধ্যে উথলে উঠতে থাকে পুলক। দেহের আগেই মন ছুটে গিয়ে এ বাগান সে বাগান ঘুরে ভালো বেতের সন্ধান করতে থাকে। ছুটি পর্যন্ত মন আর স্থির থাকতে চায় না। কেউ বলে, পীর সাহেবের পুকুরের চালায় মোটা মোটা বেত দেখেছি। চুপি চুপি একটা বেত কাটতে পারলেই দশটা ছড়ি হয়ে যাবে। কেউ বলে, বেশি মোটা বেত ভালো নয়। কেউ বলে, চিকন বেতের বাড়িতে রক্ত বের হয়ে যায়। এমন বেত ভালো, যা মোটাও না আবার চিকনও না। এতো যে আয়োজন কিন্তু তারা ভাবছে না সেই বেত কার পিঠে পড়বে। কার হাতের তালু রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে। ছেলেদের মন চুপি চুপি এ কথাই ভাবে যে, স্যারের ক্লাসের পড়া ঠিক মতো করতে পারি না। বাড়িতে কেউ পড়া বলার মতো লোক নেই। স্যারও পড়া দিয়েই খালাস। কার এতো সাহস যে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে? আবার এ কাজটিও যদি ঠিক মতো না করি, তাহলে আর কিসের ছাত্র আমি!

www.pathagar.com

মনের মধ্যে এই সান্ত্বনা যে, বেতটা আমি এনে দিয়েছি, সেহেতু স্যার অন্যদের তুলনায় আমাকে দু'এক ঘা কমই দিবেন। অথবা মারার আগে স্যার নিশ্চয়ই ভাববেন, এই ছেলেটাই আমার আদেশ পালন করতে কত পরিশ্রম করে এই ছড়িটা তৈরি করে এনেছে। ওকে নাইবা মারলাম! ছোট মনের এই সহজ যুক্তি, বাস্তবে কিন্তু মোটেই স্থান পায় না। চৈত্রের দুপুরে কৃষক যেমন দুর্বল বলদের উপর পাকা বাঁশের ছড়ি চালায়, তেমনি আঘাতের পর আঘাত চলতে থাকে ছাত্রদের হাতে এবং শরীরে। তবে একটি ছেলেকে কখনো মারেননি ফোর মাস্টার। ছেলেটির নাম সুনীল। ওর বাবা পান-সুপারীর ব্যবসা করতো। স্যার চেয়ারে বসে সুনীল বলে ডাকলেই সুনীল একগাল হেসে বলতো, আসতাছি স্যার। স্কুল থেকে দু'টো বাড়ি পরই ওদের বাড়ি। সুনীল এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে স্যারের জন্য দু'চারটা বড় পান, সুপারী এবং চুন নিয়ে ফিরে আসতো স্কুলে। সুনীলের কোনো পড়াও ধরতেন না স্যার। পড়া লেখাতে সে ছিলো ক্লাসের সবচেয়ে খারাপ ছাত্র। কখনো কখনো বাধ্য হয়ে দু'এক ঘা বসিয়ে বলতেন, তোকে মেরে কি করবো, তুইতো করবি পানের ব্যবসা। সুনীলও হেসে বলতো, আজ্ঞে স্যার।

নুরুদ্দিনের মনে ছিলো অফুরন্ত কল্পনা। তার মন বিচরণ করতো প্রকৃতির বিশাল সাম্রাজ্যে। সবুজ মাঠ আর বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো একা একা। নতুন কিছু দেখে, নতুন কিছু আবিষ্কার করে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করতো। সে কারণে স্কুলে যাওয়াটা ছিলো নুরুদ্দিনের কাছে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কাজ। স্কুলে যাবার সময় হলেই সে পালাতো। কখনো এমন হয়েছে যে, বর্ষাকালে বই-খাতা নিয়ে, স্কুলে না গিয়ে কাপড় ভিজিয়ে নানা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। দু'চারদিন সেখানেই কেটে গেছে তার। তবে পরীক্ষার সময় কখনো লুকোচুরি করতো না। কারণ, পরীক্ষা দেওয়া ছিল তার নিজের দখলে। আবার যে দিন পরীক্ষার ফল বের হতো, সেদিনও নুরুদ্দিন উপস্থিত হতো না স্কুলে। দেখা হলে অন্যরা খবর বলতো– তুই ফার্স্ট হয়েছিস।

একদিন নুরুদ্দিনও ফোর মাস্টারের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলো। সে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। স্যার ক্লাস নিচ্ছিলেন। এক সময় তিনি নুরুদ্দিনকে বললেন, তুই বারের নাম 'ক'। হঠাৎ এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনে নুরুদ্দিনের চিন্তা-চেতনা স্থির হয়ে গেলো। সে প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এ কথা বলারও সাহস হচ্ছে না তার। দুই কান দিয়ে তখন বাষ্প বের হতে শুরু করেছে। সেই বাষ্পের সঙ্গে "বার" শব্দটাও মন থেকে

www.pathagar.com

বেরিয়ে এসে নাকের ডগায় ঝুলতে লাগলো। নুরুদ্দিন "বার" শব্দটাকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। স্যারের দিক থেকে চোখ তুলে ঘরের ছাদে খুঁজতে লাগলো বারের উত্তর। কিন্তু মগজের মধ্যে কেবল কলমি ফুল, দু'চারটা কাঠবিড়ালী, কাখলে মাছের ঝাঁক ইত্যাদির দৃশ্য ভেসে উঠতে থাকে। হঠাৎ মন দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেলো হাটের উপর। সেদিন ছিলো বুধবার।

এবার "বার" এসে ধরা দিলো নুরুদ্দিনের মনে। তার মনে হলো, প্রশ্নটা একেবারেই সাধারণ। এই সাতদিনের নাম সে মুখস্থ করেছে সেই ছোটবেলায়, যখন সে স্কুলে ভর্তি হয়নি। সে যাই হোক, নুরুদ্দিন যখন উত্তরটা বলতে যাবে, তার আগেই ফোর মাস্টার বেত হাতে নিজেই উঠে এসেছেন চেয়ার থেকে। তারপর ক্রমাগত বেত চলতে লাগলো, দু'বাহুর পেশীর উপর, পিঠে এবং পায়ের দিকেও। নুরুদ্দিনের রক্তের মধ্যে জেগে উঠলো বিদ্রোহ। সে শুধু বারের নামই নয়, আরো অনেক কিছু জানে, যা ক্লাসের কোনো ছাত্রই জানে না। রাগে, অপমানে নুরুদ্দিন বই-খাতা ফেলে চিৎকার করে এলোমেলো প্রতিবাদ করতে করতে ফিরে যায় বাড়িতে।

তারপর থেকে নুরুদ্দিনের স্কুলে উপস্থিত হওয়াটা আরো কমে গেলো। বাড়িতে পড়ার সময়ও পেতো না খুব একটা। তবে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ-সাতদিন আগে থেকেই বই এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতো। অঙ্কের ব্যাপারে প্রথমেই বুঝে নিতো, উত্তরে কী চাচ্ছে। তারপর বিষয়গুলো ভাগ ভাগ করে নিয়ে লাইন ধরে আবার এগিয়ে আসতো উত্তরের কাছে। মিলে যেতো উত্তর। পরীক্ষা দিতো, রেজাল্ট ভালো হতো। শিক্ষকবৃন্দও ওর স্কুলে উপস্থিত হওয়ার জন্য চোটপাট করতেন না।

নুরুদ্দিনের নানা বাড়ি গ্রামেই। তার স্কুল ফাঁকি অথবা ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়নোর জায়গা ঐ একটিই। একদিন সে গেঞ্জি গায়ে সমবয়সী এক মামার সাথে নদী-নালা, বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে এ বাড়ি সে বাড়ির উপর দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো মামা বাড়ি। সমবয়সী মামা বললো, ফোর মাস্টারের বাড়ি চিনিস? নুরুদ্দিন বললো, না। মামা বললো, সামনের বাড়িটাই ফোর মাস্টারের।

সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। হাফ স্কুল। কিন্তু নুরুদ্দিনের সে কথা খেয়াল ছিল না। সে বললো, চল যাই। নুরুদ্দিনের চোখ দু'টো খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে

www.pathagar.com

স্যারের বাড়ি। যে স্যার তাকে সাত দিনের নাম বলতে না পারার জন্য মেরেছিলো, যে স্যার স্কুলে যাওয়ার পথে, ধান ক্ষেতে, পাট ক্ষেতে বসে কাজ করেন, বেত হাতে ক্লাসে আসেন, সুনীলের কাছ থেকে পান চেয়ে এনে খান। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে কখনো ঘুমিয়ে থাকেন। হঠাৎ তার কানে এলো স্যারের কণ্ঠ– এই তোরা গিছিলি কনে?

নুরুদ্দিন থমকে দাঁড়িয়ে চোখ ঘুরাতেই দেখলো, একটা আম গাছের নিচে বাঁশের তৈরি মাচার উপর খালি গায়ে বসে আছেন ফোর মাস্টার। নুরুদ্দিনের মুখে আর কথা নেই। সঙ্গের মামা বললো, বিলে শালুক তুলতে গিছিলাম।

– পাইছিস?

– পাইছি। বলেই সে গামছায় বাঁধা শালুক দেখালো স্যারকে।

– এদিকে আয়।

www.pathagar.com

স্যার ডাকলেন ওদের। নুরুদ্দিন লক্ষ্য করছে, স্যারের হাতে একটা কাঁসার বাটি। তার ভেতর থেকে কিছু একটা তুলে বার বার মুখে দিচ্ছেন। ফোর মাস্টারের ডাকে দু'জনার কেউ নড়লো না। তখন স্যার আবার ওদের ডাকলেন। এবার, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো দু'জনই। স্যার দু'জনের হাতে দু'মুঠো ছোলা ভাজা তুলে দিয়ে বললেন, খা। তারপর দু'জনেই দ্রুত চলে এলো স্যারের দৃষ্টির আড়ালে। ছোলা খেতে খেতে নুরুদ্দিন নিজেকে অন্যরকম করে আবিষ্কার করলো। এ কথাও ভাবলো যে, এই স্যারই একদিন আমাকে মেরেছিলেন। আবার সেই স্যারই আজ স্নেহ করে নিজের খাবার থেকে কিছুটা তুলে দিলেন আমার হাতে! এ যেনো অনেক বড় পাওয়া।

নুরুদ্দিনের মধ্যে এতোদিন যে জড়তা আর ভয় ছিলো, তা যেনো একটু স্নেহের উজ্জ্বলতায় আঁধারের মতো পালিয়ে গেলো দূরে। তারপর থেকে নুরুদ্দিন নিয়মিত স্কুলে যায়। স্যারদের প্রশ্নের উত্তর দেয় নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে। প্রশংসা আর ভালোবাসাও পেতে থাকে সবার।

একদিন প্রাইমারি ছেড়ে সে চলে গেলো হাইস্কুলে। তারপর কলেজ এবং দেশ-বিদেশ ঘুরে এলো নুরুদ্দিন। নিত্য নতুনের সাথে ঘটলো তার পরিচয়। ধীরে ধীরে ভুলে গেলো হারানো দিনের সব কিছু। কিন্তু ভুলতে পারলো না সেই ফোর মাস্টারের ছোলা ভাজার কথা, স্যারের নীরব স্নেহের কথা। যা তাকে একদিন সাহসী করে দিয়েছিলো আগামী দিনের পথ চলতে। ■

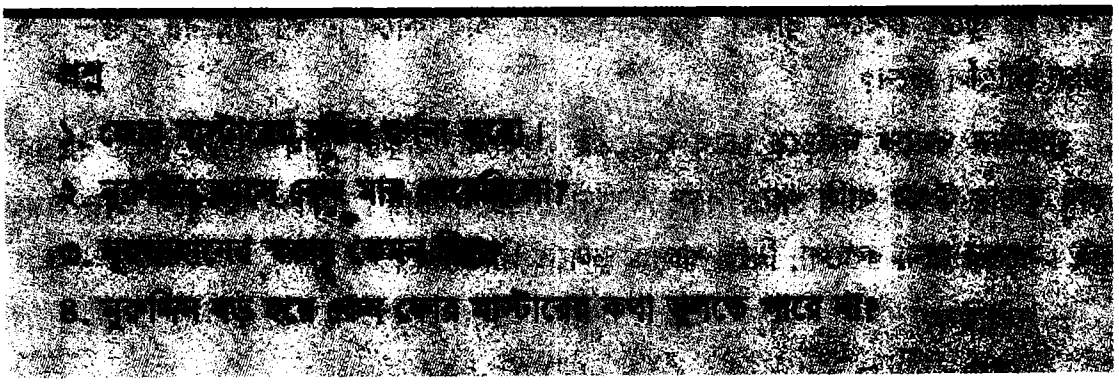

www.pathagar.com

ISBN 984-300-002342-3

খেয়া প্রকাশনী
KHEYA PROKASHONI

www.pathagar.com